অনজান

অনজান

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

প্রকাশক ঃ প্রবীর মিত্র ঃ ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবাদলচন্দ্র পাল ঃ এস্ এম্ প্রিন্টিং ঃ ১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট ঃ
কলিকাতা-৬

অনজান।

অজানা-অচেনা।

এই অজানা-অচেনার ওপর মানুষের আকর্ষণ খুব বেশি। সময় সময় মানুষ নিজের অগোচরেই অজানা-অচেনা হয়েই পড়ে অন্যের কাছে।

অন্যদেরও ঠিক একই অবস্থা।

তবু যুগ যুগ ধরে রহস্যের ঘেরাটোপে ঘেরা এই বিস্ময়কে মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে খুঁজে বার করতে। কি রহস্য কি রোমাঞ্চ কি বিস্ময় এর ভেতরে লুকিয়ে আছে।

খুঁজে কি পেয়েছে সত্যি সত্যি?

কেউ বলে, হ্যাঁ।

কেউ বলে, না।

এই দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর থাকে না। তবু আকর্ষণ তবু ভালো লাগা। তবু দুঃখ-কষ্টকে বুকে পুষে রাখা। এটা কি বিলাস?

হলেই বা বিলাস। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে একটা কিছুকে খুঁজে পেতে পায় নিশ্চয় মানুষ। তা না হলে এই অজানা অচেনা কেমন করে বেঁচে থাকে আজও। হাতছানি দিয়ে দিয়ে মানুষকে ডেকে নিয়ে যায় কাছে কাছে, আরও কাছে।

কাছে পেয়েও বুক মন ভরে কই! সত্যিকারের পাওয়া মনে হয় কই! মনে হয় যত দূরে তত দূরেই রয়ে গেছে যেন।

সারা জীবন ধরে এক জায়গায় এক সঙ্গে থেকেও আপন হয়ে ওঠে না অনেকেই অনেকের কাছে। আশ্চর্য ব্যাপার। শুধু

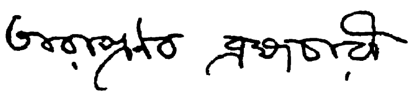
চোখের দেখা—এই দেখাতেই যেন কত জনমের অতি প্রিয় জনকে কাছে ফিরে পায় মানুষ। আপনার চেয়েও শত গুণ আপনার। পেয়েও তৃপ্তি। পেয়েও অতৃপ্তি।

কেন কেন?

অস্বীকার করতে পারে না কেউ। এটা ধ্রুব সত্য। এর শেষ কোথায়? শেষের শেষে গিয়েও আবার নতুন করে আরম্ভ। এই ঘোরা আর ফেরা। ফেরা আর ঘোরা।

'অনজান'-এর পাতায় পাতায় ঘটনার পর ঘটনার স্রোতে বিস্ময়ের পর বিস্ময় থমকে যেতে, রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ হয়ে উঠতে উঠতে আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাদের টেনে নিয়ে যাবে।

আমার অতি স্নেহভাজন প্রথিতযশা লেখক শ্রী কিন্নর রায় এই বইটির সম্পূর্ণ ডিকটেশন নিয়ে বইমেলায় তাড়াতাড়ি প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। তাকে আমার ভালোবাসা-শুভেচ্ছা রইল।





দুটি চোখ। স্রেফ দুটি।

কিন্তু ঐ দুটি থেকেই হাজার দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে। থেমে থেমে নয়। দ্রুত থেকে দ্রুত গতিতে। কি তীক্ষ্ণ। কি তীব্র!

এক লহমায় সমস্ত চত্বরটাকে, চত্বরের সমস্ত বস্তুকে, পারলে গিলে খায়। গ্রাস করে ফেলে।

আশ্চর্য।

মুহূর্তে মুহূর্তে দৃষ্টির পরিবর্তন। ওপর নিচে ডাইনে বাঁয়ে।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পরিবেশ।

সবেরই কারণ ঐ এক জন। ঝুলন।

একটা বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আর একটা বিস্ময়ের রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে অঙ্কুর। ভাবে নি স্বপ্নেও দেখেনি। এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে শোনেও নি আজ পর্যন্ত কারও মুখ থেকে।

আশ্চর্য।

মুহূর্তে মুহূর্তে দৃষ্টির পবিবর্তন। ওপর নিচে ডাইনে বাঁয়ে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পরিবেশ।

সবেরই কারণ ঐ একজন। ঝুলন।

একটা বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই আর একটা বিস্ময়ের রাজ্যে পৌঁছে যাচ্ছে অঙ্কুর। ভাবে নি স্বপ্নেও দেখেনি। এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে শোনে নি আজ পর্যন্ত কারও মুখ থেকে।

ঝুলন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে পুরো।

লাজ-লজ্জার মাথা খেয়েছে। তা ছাড়া সম্ভ্রম বলেও তো একটা জিনিস আছে মানুষ চরিত্রের, সেটাও খুইয়ে ফেলেছে দেখা যাচ্ছে।

দুঃসাহসেরও একটা মাপকাঠি আছে। একটা সীমারেখা আছে। এখন ঝুলনের কাছে ওসব কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।

ডাকলে সাড়া নেই। চোখের সামনে দাঁড়ালে দেখা নেই। চিনতেই পারছে না। যেন কত অচেনা অজানা। একেবারে বেপরোয়া। অঙ্কুরের ডাকাডাকি কানে যাচ্ছে না। কুঞ্জার ধরাধরিও বাধা মানছে না।

দৌড়ে চলার মতো করে চলছে।

চনমনে চাউনি খুঁজে বেড়াচ্ছে খালি মিরাজকে। মুখে না ডাকলেও ওর নিশ্বাসে নিশ্বাসে উচ্চারণ হচ্ছে—মিরাজ মিরাজ মিরাজ।

আকাশ থেকে যেন বাজ ঝরে পড়ছে অঙ্কুরের বুকে। অঙ্কুরের কানে। অঙ্কুরের মনে।

দিশাহারা হয়ে পড়ছে কুঞ্জা। কি করবে! কি করে আটকাবে! কি করে এই বিপদের গহ্বর থেকে টেনে বার করে আনবে ঝুলনকে বুঝে উঠতে পারছে না।

গেট দিয়ে প্রবেশ করার পর কিছুক্ষণ স্বাভাবিক ছিল ঝুলন। এমনতর হয়ে ওঠেনি। তিনটি যুবক এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। দুপাশের দুজন বেঁটেখাটো, রঙ মাঝামাঝি। মাঝেরটি লম্বা, কালো। পরনে শাদা প্যান্ট-শার্ট।

মাঝের যুবকটি প্রথমে মুখ খুলেছে।—সাব, গাইড চাহিয়ে! তিনোঁ আদমিকে লিয়ে হমলোগ তিনোঁ হ্যায়।

তিনজনের আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়েছে অঙ্কুর। ওরা কি ঠিক ঠিক ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে পারবে! ধরনধারণ দেখে মনে সংশয়।

যুবকটির সহজাত বৃত্তি তাকে সচেতন করে দিয়েছে হয়ত। নিজেই বলেছে, সাব, কলকাত্তাসে আপলোগ আঁয়ে, সমঝ গ্যয়া। আপলোগকে লিয়ে ম্যায় আচ্ছা আদমি দেতা হুঁ।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিন জনেই দৌড়ে চলে গেছে। ফিরে আসতে বেশি সময় লাগে নি। তবে এবারে ঐ লম্বা যুবকটি, আগের দুজন সঙ্গে নেই। তার বদলে একটি সুপুরুষ সুঠাম অঙ্গের মানুষ রয়েছে।

হেসে বলেছে যুবকটি, সাব, ইশারায় বুঝিয়ে দিয়েছে নতুন মানুষের দিকে তাকিয়ে, আপকা সব কুছ মালুম হ্যায়। আপলোগ খুশ হোকে জায়েঙ্গে। আপ গাইড নেহি মগর হামলোগোঁকো কি আর্জি মান লিয়া। আপ তাজমহলকো মহব্বত করতে হ্যায়। পেয়ার করতে হ্যায়। কবসে আতে হ্যায় কিসি কো মালুম নেহি।

হ্যাঁ, পছন্দসই মানুষ বটে।

কি নাম?

মিরাজ।

সুলতান বংশের কেউ কি?

মিরাজ মাথা নিচু করেছে। পেছন ফিরেছে। সামনা সামনি মুখের দিকে চেয়ে, চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় নি।

বুকের জমা নিশ্বাসটা চাপতে পারে নি। একটু জোরেই বেরিয়ে এসেছে। কানে বেজেছে অঙ্কুরের।

খুব নিচু গলায়, মোলায়েম সুরে মিরাজ বলেছে, না।

তুমি কি আরবের?

একটু চুপ করে থেকে মিরাজের একই উত্তর, না।

তবে কোথাকার?

কি যেন কি চেপে যেতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে মিরাজ।

বলো। বলতে যদি বাধা থাকে বোলো না।

মিরাজ থেমে থেমে বলেছে, আমি এখানকারই। আগ্রার।

এবার সামনাসামনি প্রথম চোখাচোখি হয়েছে মিরাজের সঙ্গে ঝুলনের। এক জনের চোখ থেকে আর এক জনের চোখ কিছুতেই সরতে চাইছে না।

কেউ এদের দেখছে কি না, কেউ কিছু ভাবছে কি না, সে দিকে কোনো খেয়াল নেই কারও। ওরা বুঝি জায়গা সময় ভুলেছে। ভুলেছে নিজেদের নিজেদেরও হয়ত।

ঝুলন। ঝুলন। ঝুলন। সজোরে পিঠে এক ধাক্কা মেরেছে কুঞ্জা।

ঝুলন চমকে উঠে ফিরে তাকিয়েছে।

মিরাজের মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে।—আপনি ধাক্কা দিলেন কেন? নিশ্চয় লেগেছে খুব।

রাগে সর্বশরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে কুঞ্জার।—আমাদের ব্যাপারে কে খবরদারি করতে বলেছে তোমাকে? এত কিসের দরদ তোমার ওর ওপর!

মিরাজ সচেতন হয়ে উঠেছে।—আমার অন্যায়। আপনারা অন্য গাইড দেখে নিন।

মিরাজ চলে যাচ্ছে। কিন্তু পেছন ফিরে তাকাচ্ছে বার বার ঝুলনের দিকে।

ঝুলনও মিরাজ যেদিকে যাচ্ছে, সেই দিকে এগোচ্ছে।

না শুনছে অঙ্কুরের মানা। না গ্রাহ্য করছে কুঞ্জাকে।

এত জোর এল কোত্থেকে! কোনো দিন কখনও এরকম দেখে নি কুঞ্জা।

ঝুলনকে ধরাধরি টানাটানি করতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। ঝুলন সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে ছুটেই চলেছে।

আকাশ নীল। ঝকঝকে তকতকে রোদ্দুর। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া। চৈতের প্রথম। আশপাশে দর্শনার্থীর ভিড়। গাইডরা বুঝিয়ে দিচ্ছে। জানিয়ে দিচ্ছে।

অঙ্কুর মহা ফাঁপরে পড়েছে। কুঞ্জা মিরাজকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে বলতেই পারত। কুঞ্জাও যা অভিমানিনী, তার বিচারের ওপর কোনো যুক্তিই খাড়া করা চলবেনা। ও তাহলে এক্ষুণি সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাবে। অথচ ঝুলনের ওপর কোনো ভরসাই করা যাচ্ছে না। কোনো কথাই ঝুলনের মুখ দিয়ে বার করা যাচ্ছে না।

পরিচয় কি তোমার সঙ্গে আগে থেকে ছিল?

ঝুলন চুপ। নিথর-পাথর মূর্তি একটা।

বলতে দোষ কি! আমার জীবনের কোনো কথা কি আমি গোপন করেছি তোমার কাছে?

এবারেও একই ব্যাপার ঘটেছে। কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি।

আমার কোনো আপত্তি নেই। মিরাজ যদি তোমার আগেকার বন্ধু হয়ে থাকে, তুমি মিরাজের সঙ্গে বেড়িয়ে আসতে পার।

পাথর নড়েছে। মুখে কথা ফুটেছে। চোখে হাসি দুলে উঠেছে।

ঠিক আছে। তুমি যাও।

না, তোমরাও চলো। তুমি, কুঞ্জা।

মিরাজকে আবার ডেকে আনা হয়েছে। কোনো গত্যন্তর নেই বুঝেই। কুঞ্জাকে কিন্তু শেখাতে হয়নি। বিদেশ বিভুঁইয়ে সে দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করা উচিত নয়। রাগিয়ে দেয়া উচিত নয়। ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া নিজের ঘরের লোকেরই টান ওর ওপর। কাকে নিয়ে লড়বে অঙ্কুর! শক্ত খুঁটি হলে রুখে দাঁড়াতে পারত।

কুঞ্জাও এসব বুঝেছে হয়ত।

একগাল হেসে বলেছে মিরাজকে, মিরাজ সাহেব! আমার কথায় কিছু মনে কর না। হঠাৎ হঠাৎ আমার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। আমি তো তোমার বহিন। রাগ করে চলে গেলে চলবে কেন?

মিরাজের মুখে হাসি।

ঝুলনের সারা শরীরে হাসির ঢেউ। গোলাপী ওড়নায় মুখ ঢেকেছে। রোদ্দুর এসে মুখে পড়েছে। সুন্দর থেকে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে ঝুলন। এই ঝুলনকে একেবারে আরব দেশেব মেয়ে বলে বেশ চালান যায়। এতটুকু খুঁত নেই।

পরনে গারারা আর কামিজ। তার ওপর ভেলভেটের জ্যাকেট। চোখে সুরমা। পায়ে সোনালী জরির কাজ করা নীল ভেলভেটের নাগরা।

অঙ্কুরের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলেছে কুঞ্জা—অঙ্কুর! সত্যি যদি সুন্দরী বলতে হয় ঝুলনই। এত লোক এসেছে এখানে। তার মধ্যে ঐ সবার

চোখ টানে। মিরাজের আর দোষ কি একদৃষ্টে দেখার!

মিরাজকে যেমন তুমি ভেবেছিলে আরবের, মিরাজও হয়ত ঝুলনকে ভাবলেও ভাবতে পারে সেই রকম। ওরকম রূঢ় ভাষায় মিরাজকে অপমান করা ঠিক হয়নি কুঞ্জার। কুঞ্জার আপসোস। এই রকমই স্বভাব ওর। হঠাৎ হঠাৎ লোককে দু কথা বলে দিয়ে নিজে অনুশোচনার আগুনে পুড়ে মরে।

মিরাজ বলছে, ভালো করে দেখুন আপনারা। শুধু তাজমহলের দিকে তাকিয়ে দেখুন নিচের দিকে তাকাবেন না। নীল আকাশে ভাসছে তাজমহল। আশপাশে কিছু নেই।

সত্যিই তাই। মিরাজের বোঝান আর দেখান অদ্ভুত ধরনের।

মিরাজের গলার স্বর বেশ স্নিগ্ধ। কথার মধ্যে এতটুকু কর্কশ ভাব নেই।

দেখুন, আগাগোড়া অঙ্কে কষা এই তাজমহল। বাদশাহ্ শাহজাহানের প্রিয় তাজমহল। প্রিয়তমা দ্বিতীয় বেগমের স্মৃতি।

শাহজাহানই মমতাজমহল নাম রেখেছিলেন তাঁর প্রিয় বেগম আরজুমন্দ বানুর।

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন মমতাজ, জাঁহাপনা আমাকে যে ভাবে আপনি ভালোবাসেন, মরণের পরেও কি সেই ভাবে বাসবেন?

হ্যাঁ বেগমসাহেবা। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়।

আর একদিন বলেছেন মমতাজ—জাঁহাপনা, কি সুন্দর স্বপ্ন দেখলুম আমি কাল রাতে। সে কি বেহশতের—স্বর্গের?

বেগমের মুখের ওপর মুগ্ধ-দৃষ্টি শাহজাহানের। শোনার জন্যে ব্যাকুল চোখ চেয়ে আছে।

বাদশাহের চোখের ভাষা, মনের আগ্রহ বুঝতে বাকি থাকে নি মমতাজের।

সে এক অপরূপ স্মৃতি। সমাধি গড়ে উঠেছে অদ্ভুত সুন্দর। সে সুন্দরের বর্ণনার ভাষা জানিনে জাঁহাপনা—কি উদাহরণ দিয়ে বোঝাব আমি। এ চোখে, পৃথিবী ঘুরে এলেও দেখা যায় না হয়ত। স্বপ্ন স্বপ্নই।

আনন্দে দু চোখ জ্বল জ্বল করে উঠেছে মমতাজের। মুখে আর কোনো কথা সরেনি।

বুকের কাছে মাথা টেনে নিয়ে বেশ জোর দিয়ে বলেছেন বাদশাহ্, মমতাজ, তোমার স্বপ্ন সার্থক হবে। তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে। যেটা বলতে পার নি, সেটা আমার ইচ্ছের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে।

পরম তৃপ্তিতে নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেলেছে মমতাজ। সুখনিদ্রার আবেশ দু চোখের পাতায়।



এতক্ষণ ধরে সহ্যের সীমায় ছিল অঙ্কুর আর কুঞ্জা। কিন্তু সে সীমারেখা, ধৈর্যের শক্ত দড়ি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হওয়ার উপক্রম এবার।

অসহ্য অসহ্য অসহ্য।

বিরক্তির একশেষ। কুঞ্জা বার বার অঙ্কুরের হাতের কবজিটা টিপে ধরছে সজোরে।—শান্ত হও। শান্ত হও। এত নিচে মনটাকে নামিও না। আমি এই প্রার্থনা করি এই মুহূর্তে, তোমার বিচারশক্তি যেন জেগে ওঠে। আমি বুঝি ঝুলনকে নিয়ে তোমার কোন সন্দেহ। ঝুলনকে নিয়ে কোন মর্মস্থানে তোমার আঘাত লাগছে, তাও আমার অজানা নয়। আমারও যে সন্দেহ দানা বাঁধছে না ভেতরে। সেটাও হলফ করে বলতে পারব না তোমায়। বাঁধছে বেঁধেছে। তবে তোমার আমার দুটো ধারণা পৃথক। তোমার মন অনেক নিচে নেমে গেছে। কিন্তু আমি জানি ঝুলন অত নিচু দুনিয়ার মানুষ নয়। হতে পারে না। ও মরে গেলেও হবে না।

কুঞ্জা! তুমি কি বোঝাতে চাইছ আমাকে। তুমি কি বলতে চাও! মিরাজের হ্যাংলার মতো ওর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা আর ওরও তাকিয়ে থাকা, জিগ্যেস করলে বোকা সাজা—কোনো উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া—এগুলো কি অভিনয় নয়?

দৃঢ়স্বরে কুঞ্জা বলেছে, না না না। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আমি তোমাকে পরে প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেব। তখন তুমি আমারটাই মেনে নিতে বাধ্য হবে—এটা নিশ্চিত।

সে তো পরের কথা পরে। কিন্তু এখনকার ছবি যা দেখা যাচ্ছে, ঝুলনের চূড়ান্ত বেলেল্লাপনা। আর মিরাজের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে আবোল-তাবোল বলেই চলেছে। তুমি কি এগুলো শুনতে পাচ্ছ না! দেখতে পাচ্ছ না! চোখ-কানের মাথা খেয়ে বসে আছ! তোমারও দেখছি বুদ্ধি ভ্রম ঘটেছে। তুমিও কি ডুবে মরেছ মিরাজের রূপের সাগরে? মিরাজ যা বলেছে মিথ্যে বলেছে। পঁয়তাল্লিশ বছরের নয় ও। জোর পঁয়ত্রিশের মধ্যে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কেলেঙ্কারির একশেষ। নিশ্চয় ত্র্যহস্পর্শ দোষ ছিল। পাঁজি না দেখে বেরিয়ে যা খোয়ার হওয়ার হচ্ছে। কি বিভ্রাট! কি বিভ্রাট! এমন হবে

জানলে এখানে—ফতেপুরে ঐ বুলন্দদরওয়াজার ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরত। এসব চোখে দেখতে হতে না।

অঙ্কুর, কথাবার্তা একটু সাবধানে কও। দেখ ঝুলন চনমন করে তাকাচ্ছে পেছন দিকে। নিশ্চয় কানে এসব কথা যাচ্ছে। ও খুব স্পর্শকাতর মেয়ে। তোমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পারা যাবে। ঝুলনকে পারব না। দোহাই তোমার, দু হাত জোড় করে বলেছে কুঞ্জা।

ঝুলন বলছে মিরাজকে, তুমিই তো ফতেপুর-সিক্রিতে সমস্ত ঘুরিয়ে আমাকে দেখিয়েছ না?

হ্যাঁ, আমিই তো দেখিয়েছি সব। সেলিম চিস্তির সমাধি, বুলন্দদরওয়াজা। কি সুন্দর। কি আশ্চর্য আকবরের লাল পাথরে গড়া সমাধি। জাহাঙ্গীর বাদশাহ হয়ে শ্বেতপাথর বসিয়ে দিয়েছেন। চারপাশে শ্বেতপাথরের জাফরির কাজ। প্রতিটি নকশা আলাদা। কত, কত বছর হয়ে গেছে। কত যুগ কেটে গেছে। তবু যেন মনে হয় কেউ নতুন করে দিয়ে গেছে।

মিরাজ বলছে কেন, কত সুন্দর আকবরের হাওয়া মহল, যোধাবাঈয়ের প্রাসাদ, চতুর্দিকে জল। মাঝখানে মঞ্চ। চার দিক দিয়ে মঞ্চে পৌঁছনর সেতু। ওখানে বসে তানসেন গাইছেন। আর প্রাসাদে বসে শুনছেন আকবর। মনে হয় সে দিনের সব মানুষ প্রাসাদের মধ্যে যেন ঘুমিয়ে আছে। এখুনই জেগে উঠবে। নাচ গান, বিচার সব শুরু হয়ে যাবে।

এসব কথা শুনে কার না মাথা গরম হয়! মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে। ঝুলনের সব কিছু মিথ্যে। ঝুলনকে এতদিন বাদে ধরতে পেরেছে অঙ্কুর। এ মেয়ে এত চাপা, এতদিন চিনতে পারা যায় নি, বুঝতে পারা যায় নি। মিরাজের সঙ্গে দেখা হতে ওর আসল রূপ ধরা পড়েছে।

মাথায় বুকে রক্তের দাপাদাপি নিশ্বাসের ওঠাপড়া। মনে হচ্ছে ঝুলনকে এখান থেকে নিচে ফেলে দেয়। একে নিয়ে থাকা অসম্ভব তার জীবনে। ঘর করার কথাই ওঠে না। কুঞ্জাও ঐ দলের নিশ্চয়। এত দেখে শুনেও খালি ঝুলনের প্রশস্তি গাইছে। দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ছে না।

মিরাজ ঝুলন এবার ওপরে উঠে এসেছে। পেছনে কুঞ্জা অঙ্কুর। ভেতরে ঢুকেছে সকলে। মিরাজ ঝুলনের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। কুঞ্জাকে অঙ্কুরকে দেখেও দেখছে না।

একতলায় সমাধি। শাহজাহান আর মমতাজের। দোতলায় তার স্মৃতি। স্মৃতির উদ্দেশে সকলেই গোলাপ ফুল নিবেদন করেছে।

নিবেদনের ঘরেই বসে পড়েছে ঝুলন।

মিরাজ বলেছে, কী হলো?

বুকে অসহ্য যন্ত্রণা।

মিরাজ তাড়াতাড়ি পাঁজাকোলা করে ঝুলনকে ভেতর থেকে বাইরে বার করে নিয়ে এসেছে।

প্রমাদ গনেছে অঙ্কুর আর কুঞ্জা।

একি! হঠাৎ এরকম!

অঙ্কুর ওপর থেকে ঝুলনকে ফেলে দেবে বলেছে মনে মনে, রাগে। তারই দীর্ঘ নিশ্বাসের বিষক্রিয়ার ফল কি এই! না, না। ঝুলনকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু ঝুলনের মৃত্যু চায় না।

মুখের রক্ত সরেছে। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুখখানা অঙ্কুরের। দু'চোখের জল উপচে পড়ছে কুঞ্জার।

কুঞ্জা, অঙ্কুর মিরাজের দু হাত দুজনে চেপে ধরে বলেছে, ঝুলনকে বাঁচাও। যে কোনো উপায়ে।

শ্বেতপাথরের চাতালে শুয়ে আছে ঝুলন। বেহুঁশ মিরাজ দু হাত তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। দু চোখে জল টলটল করছে। কান্না ভেজা গলায় বলছে, খোদা মেহেরবানি করো, মেরা জান লেকর ইনকো নয়ি জিন্দেগি দে দো। দে দো। য়ে মেহেরবান...। কিছুক্ষণ।

আশ্চর্য! শোনা যায় বাবর হুমায়ুনের জন্যে এরকম প্রার্থনা করেছেন। হুমায়ুন বেঁচে উঠেছেন। কিন্তু তার পরিণতিটা বড় করুণ। অসুস্থ হয়েছেন বাবর।

জোড়হাতে প্রার্থনা করেছে কুঞ্জা—

ভগবান! মিরাজের যেন কোনো অশুভ না হয়। এমন মহৎ হৃদয়ের মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকুক শত শত। মানুষকে বাঁচানর জন্যে নিজের জীবন দান।

ধীরে ধীরে জ্ঞান এসেছে ঝুলনের।

বুক খালি করা জমা নিশ্বাস ঝরে পড়েছে আস্তে আস্তে। চোখের পাতা পড়ছে। খুলছে। একটু একটু—সম্পূর্ণ।

আবেগ চাপতে পারে নি কুঞ্জা। মিরাজের দুহাতের উল্টো পিঠে চুমু খেয়ে বলেছে, যুগ যুগ জিও ভাইসাব। যুগ যুগ জিও।

মিরাজের দু গাল বেয়ে টস টস করে জল ঝরেছে। শোকে নয় দুঃখে নয় কোনো আঘাতে নয়। আনন্দে। আকাশ ভরা মহানন্দে।

অঙ্কুর দু'চোখে দু হাত চাপা দিয়ে ফোঁপাচ্ছে। যত নষ্টের মূল সে। কত না কুচিন্তা

করেছে এই মিরাজকে নিয়ে। কত না মুণ্ডুপাত করেছে ঝুলনের। আজ মিরাজ না থাকলেও—

দু হাতে সজোরে নিজের মাথা চাপড়েছে অঙ্কুর।

কুঞ্জা এসে পেছন থেকে হাত দুটো চেপে ধরেছে।

একি! পাগল হলে নাকি!

না। না কুঞ্জা। আমার প্রায়শ্চিত্ত কি বলে দিতে পার? আমার ভেতরে একটা যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছে।

আঙুলের ইশারায় চোখ ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কুঞ্জা। দু হাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে ঝুলন। সাহায্য কর। এখন এসব চিন্তা মাথাতে রেখ না।

মিরাজ দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্য করতে।

ঝুলন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।—কে!

অঙ্কুর কুঞ্জা! তোমরা কোথায়! কোথায় আমি! তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না কেন!

দু হাতে অন্ধকার হাতড়াচ্ছে যেন ঝুলন।

অঙ্কুর কুঞ্জা কাছে এসেছে।

অঙ্কুরকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা ঝুলন। জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখেছে।

অঙ্কুর! বড় অশ্বস্তি ভেতরে আমার। এখান থেকে নিয়ে চল তুমি। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বেশিক্ষণ থাকলে, আমাকে ফিরে পাবে না। কেন এমন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কিচ্ছু না। কিচ্ছু না।

কুঞ্জার গলা এমনিতেই সপ্তমে চড়া। তবে এক্ষেত্রে দেখা গেল একেবারে খাদে নেমে গেছে।—এখান থেকে আমরা এখনই নিয়ে যাচ্ছি তোমায়।

দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ মিরাজ। দৃষ্টি অপলক। ঝুলনের দিকে। বাঁ হাতের মাঝের আঙুল চিবুকে ডান হাত বুকের ওপর দিয়ে বাঁ কনুই ছুঁয়ে। ভঙ্গিটা রাজকুমার বা শাহ্জাদার।

এতক্ষণ ঝুলন একবারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকায় নি। মিরাজকে দেখে নি। মিরাজের নাম পর্যন্ত মুখে আনে নি। আচমকা একটা উর্দু গজলের সুর কানে ভেসে আসতেই ফিরে তাকিয়েছে।

লালচে ঠোঁট দুটো নড়ছে। মিরাজের সুমধুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বাতাসে।

কান পেতে শুনছে ঝুলন। দু চোখ বুজে গাইছে ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

যিসনে দিয়া হ্যায় দর্দে দিল
উনকো খুদা দোয়া করে

আশিকে না মুরাদ কো
উনকো খুদা পুরি করে
বারে আলম উঠায়ে হম
সিকুয়া না লব্‌পে লায়ে হয়
হমতো ওয়াফা কে ইয়াদি হ্যায়
কই বেওয়াফা কেয়া করে...।

গান থেমে গেছে।

পাগলের মতো হয়ে উঠেছে ঝুলন! একি! শেষ করল না কেন!

দৌড়ে মিরাজের কাছে গেছে।

কেন, কেন! কেন এই গান বন্ধ করল! শেষ কর। শেষ কর।

শেষ জানি না। শেষ খুঁজে পাই নি। অনেক কৌশিশ অনেক চেষ্টা। হয়রান আর হয়রান। স্রেফ নাস্তানাবুদ। জিন্দগি বরবাদ।

একি কথা শুনল ঝুলন! একি কথা শুনছে সে! সত্যিই কি কানে শুনছে না প্রাণে শুনছে! নিজে এই গান কত না খোঁজাখুঁজি করেছে। কত লোকের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিয়েছে। সেই একই উত্তর—একি নিজের ভেতরের না পাওয়া কান্নার প্রতিধ্বনি শুনেছে মিরাজের মধ্যে দিয়ে!

মিরাজের দু হাত ধরে ঝুলন বলেছে, মেহেরবানি করুন।

মিরাজ দু চোখের দৃষ্টি আকাশে মেলে ধরেছে। কি যেন কি ভাবতে চেষ্টা করেছে।

শান্ত গলায় বলেছে, কোন জানে খুদা কি মর্জি কব হোগি।

বেরিয়ে আসছে তাজমহল চত্বর থেকে ওরা তিনজন।

অঙ্কুর ঝুলন আর কুঞ্জা।

পেছনে মিরাজ। ধীর গতি।

গেস্ট হাউসটা যেন কেমন কেমন। একটা যোল বছরের ছেলে, রহস্য মাখান দৃষ্টি। ঝাঁপিয়ে পড়েছে অঙ্কুরের ওপর।

আইয়ে আইয়ে আইয়ে। আপ লোগোঁ কো সব কুছ মিল জায়েগা।

কুঞ্জার সন্দেহ। ঝোপ বুঝে কোপ মারা একেই বলে। ছেলেটা বড় চতুর। নাদুস-নুদুস বাবু পেয়েছে তো অঙ্কুরকে। আদুরে দুলাল। শাদা সিল্কের পাজামা-পাঞ্জাবি পরনে। হাসি হাসি মুখ। শিকারীরা দেখলেই বুঝতে পারবে এ শিকার তদের মস্ত

ভোজ। অঙ্কুরকে ফাঁদে ফেলা একটুও কঠিন নয়। দেখা যাক শেষ অব্দি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ছেলেটা হাত ধরে ধরে টেনে টেনে আয়না বসান দরজা খুলে এক একজনকে ভেতরে ঢুকিয়েছে।

হা হতোস্মি! বড় হল। লোকজনের নাম গন্ধ নেই। টিমটিমে আলো জ্বলছে সিলিংয়ে সার বেঁধে। সারি সারি টেবিল চেয়ার সাজান। খাবার প্লেট পাতা। লোক নেই একটাও। একটা ভুতুড়ে ভুতুড়ে গন্ধ গোটা ঘরখানায়। অস্বস্তির এক শেষ।

লোক নেই কেন?

ছেলে গলায় বুড়োর আওয়াজ। —সময় হলেই আসবে। সময় হলেই ঘর ভরে যাবে।

কুঞ্জার মন বসতে চাইছে না। এক তিল দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে না। দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। ঘরের বাতাস ভারী।

নিচে চেঁচামেচি গণ্ডগোল শুনে মালিক নেমে এসেছে ওপর থেকে। লালচে রঙ। সিল্কের পাজামা আর পাঞ্জাবি পরনে। চুল নেমে এসেছে ঘাড় অব্দি। লালচে চুল, দাড়ি গোঁফ। চোখের তারায় নীল আভা। টিকোলো নাক।

ঝগড়া মেটাতে এসে মালিকের মনের অদ্ভুত পরিবর্তন।

ঝুলনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠেছে, আপ! এতনা রোজ বাদ! তারপর মিরাজের দিকে তাকিয়ে, ভাইসাহেব আপ ভি!

দুজনেরই ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক। ঝুলন আর মালিক নসিবের। অঙ্কুর আড়চোখে তাকিয়েছে কুঞ্জার দিকে।

কুঞ্জার দু চোখে বিস্ময়।

মাথাটা কি রকম ঝিম ঝিম করে উঠেছে। কি ব্যাপার ঘটতে চলেছে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। এক রহস্যের জট খুলতে গিয়ে আর এক রহস্যের জটের ফাঁদে আটকে পড়ছে।

ঝুলনকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠতে পারে। অঙ্কুরের সঙ্গে মিল রাখা অসম্ভব হলেও হতে পারে। তার যুক্তি তার সব কথা কি মেনে নেবে অঙ্কুর শেষ অবধি!

যা সব টুকরো টুকরো ঘটনা ঘটছে, অসম্ভব সম্ভব, সম্ভব অসম্ভব।

কুঞ্জা ঝুলনের ওপরে রেগে গেছে। রেগে যাচ্ছে। নিজের মনে মনেই বলছে।, তোর যদি আগে থেকেই সব জানা পরিচয় ছিল, সেটা বলিস নি কেন? কুঞ্জাকে এত ভালোবাসিস, ছোটবেলা থেকে দেখেছিস, এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারিস নি! কুঞ্জা

তো নিজের গোপন অ-গোপন কথা বলতে কিছু বাকি রাখে নি ঝুলনের কাছে।

যে সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে এতে ঝুলনকে সাবিত্রী বলে চালান মুশকিল।

নসিবের কথায় মধু ঢালা। খানদানি আবেদন।—আইয়ে পাধারিয়ে। ইয়ে সবাই তো আপলোগোঁকে হ্যায়। ধুপ মে খড়ে কিঁউ! ভিতরমে জরা আরাম কিজিয়ে।

লোক দেখান আদিখ্যেতা যদি আন্তরিকতার ভূমিকাও নেয়, তাহলে নরম মনের মানুষেরা সাড়া না দিয়ে পারে না। সেই দশা অঙ্কুর কুঞ্জার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেতরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

মিরাজ আর ঝুলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কিছু বুঝতে পারা যায় নি।

ওরা দুজনে এগিয়েই রয়েছে। 'আইয়ে' বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকে পড়েছে। কোনো ইতস্তত করে নি।

ছোট ছেলে—বয়টা একদৃষ্টে তাকিয়ে। চোখের পাতা নড়ছে না। আঁকা চোখ বুঝি। দেখেছে তো দেখছেই।

অন্যদের বেলা মালিক আদেশ করে, তার ওপর হম্বিতম্বি করে। এক্ষেত্রে মালিক নিজেই পরিবেশন করছে ঠাণ্ডা শরবত দু হাতে গেলাস ধরে—পিজিয়ে পিজিয়ে। মেহেরবানি করিয়ে।

গোল টেবিল ঘেরা চেয়ারে বসে সবাই।

আনন্দ আর পরিতৃপ্তির চিহ্ন মুখে মুখে। চোখে চোখে।

নান রুটি মটর-পনির আর চানার ডাল।

খাওয়া-দাওয়া শেষে বড় কলকা আঁকা কার্পেট মোড়া সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায় উঠেছে সবাই নসিবের পেছু পেছু।

দেয়ালের পাশে পাশে সিঁড়ির ধাপে দাপে রঙ-বেরঙের ফুল গাছের টব।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে গুন গুন করে গাইছে মিরাজ—কিংবদন্তীর গায়ক সঙ্গীত সম্রাট আবদুল করিম খাঁ-র ভজন গানের শুরুর দুটি কলি—

হরি সে ভেদ না পাও রামা
কুদরত তেরে রঙ্গ বিরঙ্গী...

প্রথম যে পরিবেশ ছিল ভেতরে এসে ওপরে উঠে সে পরিবেশ বদলে গেছে। এ যেন নিজেরা এক এক জন নতুন দেশের নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। আনন্দে ভরপুর।

প্রতিটি ঘরই রঙ-বেরঙের কাশ্মীরি কার্পেটে মোড়া। সুন্দর খাট-বিছানা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কার্পেটের রঙের সঙ্গে রঙ মেলান জানলা-দরজার পর্দা। দেয়ালে পঙ্খের কাজ দরজা জানলার ধারে ধারে নীল লতা-পাতার নকশা।

হাঁপিয়ে উঠেছে ঝুলন।

ঝুলনের হাত ধরে কুঞ্জা বেরিয়ে এসেছে। পেছনে অঙ্কুর মিরাজও।

ছেলেটা খুব চেষ্টা করেছে আটকাবার।—খাবার রেডি। দাম দিতে হবে, খাও আর না খাও। বেডরুম ঠিক করা হয়েছে মিরাজকে নিয়ে চার জনের দুটো। ভাড়া দিয়ে যেতে হবে, থাকো আর না থাকো।

পাশাপাশি দুখানা ঘর। সাজ-সজ্জা একই রকমের। প্রথমটা কুঞ্জা আর ঝুলনের। অঙ্কুর আর মিরাজের দ্বিতীয়টা।

ঘর দেখিয়ে দিয়ে নসিব বলেছে, যতদিন ইচ্ছে আপনারা থাকতে পারেন। সুবিধে অসুবিধে হলে আমাকে ডাকবেন। আমি এই তলাতেই উত্তরের ঘরটায় থাকি। শেষের ঘর।

এসে যা খেয়েছে সব, রাতে কারোরই খেতে ইচ্ছে নেই আর। কেবল ঘুমোতে ইচ্ছে করেছে।

শোয়ার আগে নসিব এসে দেখা করে গেছে। জানিয়েছে শুভ রাত্রি।

ঝুলনের দিকে তাকিয়ে হেসেছে। আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে একবার। মিরাজের চোখে চোখ পড়তে এদের হাসির ছায়া ফুটে উঠেছে।

বার বার বলে গেছে নসিব।

অঙ্কুর কুঞ্জাকে ডেকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, খুব সাবধানে থেকো। ভালো করে দরজা বন্ধ করে রেখো। তোমার মনে কি রকম লাগছে?

খারাপ নয়।

আমার কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে না।

ঝুলন আবার অন্যমনস্ক। হাসি চাউনি—সব পাল্টে যাচ্ছে। ভাবতে পারছি না। আর ভাবতেও চাইছি না। যত সমস্যা ঝুলনকে নিয়েই। ও যদি এখানে থেকে যেতে চায় এদের সঙ্গে, থাকতে পারে। আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচি। এদের হাসিতে চাউনিতে কেমন একটা সব কিছু জানা জিনিসটাকে লোকটাকে লোকচক্ষে অজানা করে রাখার চেষ্টা। তাই নয় কি?

মিরাজ এক রহস্যময় পুরুষ। তার আগমন সঙ্গে গমন—সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা কেমন কেমন ভাব। নসিব ঝুলনকে কি যেন কি বলতে গিয়ে থমকে গেছে একটু। ঝুলনের পেটে ডুবুরি নামিয়ে কোনো কথা বেরুবে না। বৃথা চেষ্টা। কোনো লাভ নেই। কিছু জিগ্যেস করলেই ঝুলন উদাসীন বৈরাগিনী। চোখের দৃষ্টি কোথায় চলে যায় কে জানে! মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। এ সব কি অভিনয় না ব্যামো? নাকি সত্যি সত্যি ওর অতীত জীবনের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের সাক্ষাৎ। যেটা ঝুলন ভাঙতে চায়

না। মুখ ফুটে বলতে চায় না।

তাতে হয়েছে কি! ওর মতো জীবন তো একশোর মধ্যে একশো জনেরই। এতো হয়েই থাকে।

অঙ্কুরের জীবনে কি হয় নি! কুঞ্জার জীবনে কি হয় নি! এতে দোষের কি! ঝুলনকে নিজের হাতে তুলে দেবে, সে মিরাজই হোক নসিব নসিবই হোক, অঙ্কুরের কিছু আসে যায় না। অঙ্কুর খোলাখুলি ভালোবাসে। সে দিলখোলা মানুষ। আগেকার জীবন দেখতে চায় না। ফিরতেও চায় না। তার ইচ্ছে তো আর ঝুলনের ইচ্ছে হতে পারে না।

মনকে দু ভাগ করে রাখা ঠিক নয়। দুভাবে ভাগ হওয়া মানেই প্রেমের বেসাতি। আসল ভালোবাসার মৃত্যু।

ঝুলনের নিন্দেবান্দায় কুঞ্জা খুবই অসন্তুষ্ট হয়। তার শুনতে ভালো লাগে না। এখানে না শুনে উপায়ান্তর নেই। দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা, চলতে যাওয়া চলতে শেখায় পাঠ ঝুলন নেয় নি কখনও জীবনে। কাকে বোঝাবে! এক্ষেত্রে অঙ্কুরের মাথাটা এমনই বিগড়েছে, সবটাতেই ও উল্টো বুঝবে।

ঝুলনের মনের কথা প্রাণের কথা সবই কুঞ্জার সঙ্গে। দ্বিতীয় কোনো বান্ধবী নেই। কোনো পুরুষ বন্ধু নেই। জ্ঞান হওয়া থেকে ঝুলন সঙ্গী। প্রায় সমবয়সী বললেও চলে দুজনে।

কুঞ্জার মুখ দিয়ে একটা কথাই বেরিয়ে এসেছে—যা কিছু কর কোরো, ছাড়তে হয় রাখতে হয় যা বোঝো, নিজে বুঝো। আমার আপত্তি করার কিছু নেই। বাধা দেয়ার ইচ্ছে নেই। মিলন করাবারও ইচ্ছে নেই। আমি এইটুকু চাই লঘু পাপে গুরুদণ্ড না হয়ে যায়। বিচার, সুবিচার। যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। রাত বাড়ছে। মাথাটা ঠাণ্ডা রেখো। শুয়ে পড় গিয়ে। আবারও বলছি। বলা অভ্যেস তাই বলছি। শেষ অবধি এই কথাই তোমায় আমি বলে যাব, মাথার ঠিক রেখ। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখ।

গুড নাইট।

ঘুম ঘুম ঘুম।

এত করে ঘুমকে ডাকছে। প্রার্থনা করছে। কিছুতেই মানছে না। কিছুতেই চোখে আসছে না কুঞ্জার। কেবলই মনে হচ্ছে এখানে না এলেই ভালো ছিল।

চোখ দেখাতে এসে একি ফ্যাসাদ!

দু তিন মাস ছাড়া ছাড়া দিল্লিতে আসতেই হয় কুঞ্জাকে ডাক্তার দেখাতে। চোখে গ্লুকোমা। দেখলে মানুষজন বুঝতে পারবে না। মনে হবে সুন্দর দৃষ্টি। তাকিয়ে আছে। ওর চোখের তারা নাকি কথা কয়। মানুষের দেখাকেও বলিহারি! সময় সময় হাসি

পায়। মনে হয় চোখ তার যায় নি। সত্যি সত্যি। যারা দেখে তাদেরই গেছে।

ডাক্তার বলেছে, একটা চোখ তোমার গেছে বটে, কিন্তু এখনও তো একটা চোখে কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছ। এই বেলা দেখে নাও। ঘুরে এস। তাজমহল না দেখলে মস্ত ভুল করবে জীবনে।

দেখতে এসে কাল হলো তার। নিজের চোখ নিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে সবে মাত্র তন্দ্রা এসেছে। এমন সময় দরজায় খট খট আওয়াজ।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে। খাটে। অবাক। পাশে নেই ঝুলন।

নাইট ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে। সামনে নজর পড়তে দেখে ঝুলন দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। ওহো! ওখানে একটা ছবি আছে পর্দা ঢাকা। পর্দাটা সরান দেখছে তো।

ঝুলন! ঝুলন!

কোনো সাড়া নেই।

দরজায় টোকা মারার আওয়াজটা বেড়েই চলেছে ঘন ঘন। কি করবে কুঞ্জা ভেবে পাচ্ছে না। দরকার পড়লে ডাকতে বলে দিয়েছে নসিবসাহেব।

খুলব কি খুলব না—দোনামোনা করতে করতে দরজা খুলে ফেলেই নসিবকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। তখনও ঝুলন ছবির সামনে দাঁড়িয়ে।

একগাল হেসে নসিব বলেছে, ওটা আমার অল্প বয়েসের ছবি। বলেই করিডোর দিয়ে হন হন করে চলে গেছে নিজের ঘরের দিকে।

দরজা বন্ধ করে ঝুলনের কাছে এসে ছবির পর্দাটা টেনে নামিয়ে দিয়ে হাত ধরে টেনে এনে জোর করে শুইয়ে দিয়েছে বিছানায়।—কি দেখছিলি অত! ঘুমিয়ে পড়। কালই এখান থেকে চলে যাব।

ঝুলন চরিত্র অদ্ভুত। ও যেন ওর মধ্যে নেই। দেহটা রয়েছে। মনটা কোথায় উধাও।

খানিক পরে আবার দরজায় টোকা। জ্বালাতনের একশেষ। এবারেও তন্দ্রার ঘোর আসতে না আসতেই ঘুম ছুটেছে কুঞ্জার। আগের মতো পাশে নেই ঝুলন। চেয়ে দেখে ছবির সামনে দাঁড়িয়ে। পর্দা সরান।

আঃ! কি উৎপাত!

দরজা খুলেছে কুঞ্জা। সেই একই দৃশ্য। নসিব এক গাল হেসে বলেছে, ওটা আমার কম বয়েসের ছবি।

আবার ঝুলনকে টেনে এনে শুইয়ে দিয়ে বলেছে, তুই তো আমাকে ঘুমোতে দিবি নি! শুয়ে থাক চুপ করে। নইলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব।

খাটে বসে ঝুলনের দু কাঁধ হাত দিয়ে খামচে ধরে জোরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে উঠে

বলেছে, বলি, মরেছিস না বেঁচে আসিছ! মরণ কি হয় না তোর! ম'লে তো হাড় জুড়োয় আমার।

কোনো উত্তর নেই।

পাশে বসেছে কুঞ্জা। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, ষাট ষাট ষাট মুখ দিয়ে কি বেরুল রে আমার! তুই বেঁচে থাক ঝুলন। আমার পরমায়ু নিয়ে তুই বেঁচে থাক। মরণ আমারই হোক।

কোনো উত্তর নেই।

নিশ্চুপ নির্বিকার ঝুলন।

ঝুলনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মনে মনে প্রার্থনা করেছে কুঞ্জা—ঈশ্বর, তুমি যদি থাকে, একটুখানি ঘুম দাও আমাদের দু জনের চোখে। আর পারছি না।

ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়েছে কুঞ্জা।

ঘুম ভেঙে দেখে ঝুলন ঘরে নেই। না ছবির কাছে না আশপাশে।

ধড়াস করে উঠেছে বুকের ভেতর।

তখন ভোরের আলো ফুটছে সবে।

দেয়ালে ঝোলানো সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল পেইনটিংয়ের ওপরের পর্দা সরান। নিশ্চয় ঝুলন দেখছিল। নিশ্চয় নসিব এসেছে। দরজায় টোকা দিয়েছে। কি মরণ-ঘুম না ঘুমিয়ে পড়েছে কুঞ্জা। কোনো সাড়া-শব্দ পায় নি।

পাগলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। পাশের ঘরের দরজায় টোকা নয়, দুম দুম করে ঘুষি মেরেছে। উঠে পড়েছে অঙ্কুর মিরাজ। কুঞ্জার চেহারা মুখচোখ দেখে ওরা দুজনেই হতভম্ব হতবাক। কুঞ্জা দাঁড়ায় নি। কিচ্ছু বলে নি ওদের। ছুটে চলে গেছে নসিবের ঘরের দিকে।

হাট করে দরজা খোলা। ঘরে নেই নসিব।

কোথায়! কোথায়। কোথায়!

চিৎকার করে উঠেছে কুঞ্জা।—ঝুলন ঝুলন ঝুলন।

আকাশে বাতাসে গাছের পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনি উঠেছে—ঝুলন ঝুলন ঝুলন।



লজ্জা মান ভয় আর কান্না।

ঘোরতরভাবে কুঞ্জাকে ঘিরে ধরেছে। এদের আওতা থেকে বেরবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। হাঁপিয়ে উঠছে। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

কেবলি মনে হচ্ছে সে দিনের সে রাতের কথা। এ সময় এমন অলুক্ষুণে কথা কেন মনে আসছে!

সরে যা সরে যা বললেও সরছে কোথায়!

সে দৃশ্যের কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয় এখন।

খুড়তুতো ভাই সুকেশ।

রাত চারটেয় পাকুড়ে গিয়ে নেমেছে। ফাগুনের শেষ প্রহর। তারা ভর্তি আকাশ। হিম হিম বাতাস। সুনশান স্টেশন। লোক বলতে একটি কুলি এসে সামনে দাঁড়াল। সারা প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা।

জিগ্যেস করেছে, অল ইন্ডিয়া স্টোন চিপস সাপ্লায়ার কর্পোরেশনের গেস্ট হাউস কোথায়?

কুলির মুখে এক গাল হাসি। আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছে—ওপারে। রেল লাইন পেরুলেই।

কথা যেই কাজ সেই।

দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সুকেশ আর কুলি। দেয়ালের একটা গর্তে পা দিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেছে কুলিটি—ওপারের রাস্তায়।

ডেকেছে—আইয়ে সাব আইয়ে।

চোখের কোণে তামাশার নেশা। কুলিটি বুঝতে পেরেছে সুকেশ উঠতে পারবে না তার মতো। তার মতো তাগদ হিম্মত নেই বাবুসাহেবের।

তখন রাত চারটে।

নিজের অসহায়তা আর অক্ষমতার কথা জানিয়েছে সুকেশ কুলিকে। সে পারবে

না। পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙে জড়ভরত হয়ে থাকতে হবে তাকে।

জোরে হেসে উঠেছে কুলিটি। ইটের গর্তে পা রেখে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিতে বলেছে। বাঁ হাতটায় কুলির হাত পড়েছে, এটুকু মনে আছে সুকেশের। কিছু বোঝার আগেই ওর পাশে গিয়ে উপস্থিত!

অদ্ভুত ওর শক্তি আর তোলবার কায়দা। জনশূন্য ফাঁকা রাস্তায় চলেছে দুজনে। উত্তর থেকে উত্তরে। আরও উত্তরে।

দু সারি বাড়ি। ঘুমন্ত।

ভেতর থেকে জানলা-দরজা বন্ধ।

কিছুক্ষণ চলার পরে খেয়াল হয়েছে সুকেশের। পেছন ফিরে দেখে স্টেশন প্ল্যাটফর্ম অদৃশ্য—উধাও।

বলেছে, তোমার ভুল হচ্ছে। কত দূরে চলে এসেছি, কোথায় গেস্ট হাউস! এখানে কোনো বাড়িতে ডেকে জিগ্যেস করা হোক।

কুলিটি বলেছে, নেহি। ওলোগ নিদ মে হ্যায়।

আবার চলা শুরু। দুজনে পাশাপাশি।

একজনের নিশ্বাস দ্বিতীয় জনের হয়ে উঠছে বুঝি। এক সঙ্গে পড়ছে। এ মনের কথা ও মনও শুনে ফেলবে এখুনি।

সুকেশের দ্বন্দ্ব সংশয়।

যদি ও বুঝতে পারে তাকে সন্দেহ করছে, তাহলে রক্ষে নেই তার। ও ভয়ংকর হয়ে উঠবে। অচেনা রাস্তা ঘাটে ওর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া মুশকিল। ছুটে পালান আরও বিপদ।

কৌতুকের হাসি হাসতে হাসতে কুলিটি বলেছে, বাবুসাহেব, ঘাবড়াইয়ে মত। মত ডরিয়ে। বিশোয়াস রাখিয়ে।

সর্বনাশ।

তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে কুলিটি। এখন ওর হাতে সুকেশের জীবন-মরণ।

তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে কুলিটি। এখন ওর হাতে সুকেশের জীবন-মরণ।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। না গিয়ে উপায় নেই। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে সুকেশ।

কি চায়! হাতের আংটিটা!

দিয়ে দেবে।

পকেটের টাকা কটা?

দিয়ে দেবে।

গায়ের শালটা?

দিয়ে দেবে।

অন্ধকার রাতে অন্ধকারের অতলতলে বুঝি এইভাবে হারিয়ে যায় মানুষজনেরা। খুঁজে পায়না কেউ। খুঁজে পাবেও না কোনো দিন।

অন্ধকারে চোখ ফুঁড়ে ফুঁড়ে দেখছে সুকেশ। একটু তফাতে জলাভূমি। বাড়িঘর হারিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ।

কত জীবন নিরুদ্দেশের পথে এই ভাবে হারিয়ে গেছে। কেউ জানে না। কেউ জানে নি। কেউ জানবে নাও কখনও। কীভাবে গেছে কেমন ভাবে গেছে কোথায় কোনখানে।

সুকেশ নিজেও জানে না কেমন করে ভেতরে একটা অসম্ভব জিদ এসে গেছে।

গলায় জোর এনেছে। পষ্ট ভাষায় বলেছে, আর এক পা-ও এগোব না।

হেসে উঠেছে কুলিটি।—ঠিক হ্যায়।

অন্ধকারে বুঝতে পারা যায় নি। পাশে একটা একতলা বাড়ি। মনে হয়েছে পোড়ো ভাঙা।

দরজায় আওয়াজ করেছে কুলি।

কে! নারীকণ্ঠের আওয়াজ।

একি!

গেস্ট হাউস তো দোতলা। সেখানে কোনো মহিলা তো থাকে না। এখানে বাঙালি মহিলার কণ্ঠস্বর!

পায়ের তলায় মাটি সরার মুখে। প্রাণপণে নিজেকে নিজের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে সুকেশ।—না না না। কোনো বাঙালি মহিলাই নেই গেস্ট হাউসে। তোমার ভুল ভুল ভুল।

ঠিক হ্যায়। সুকেশের কাছ থেকে সরে গেছে একটু কুলিটি। চিৎকার করে ডেকেছে, মাস্টারসাব।

গোটা বাড়িটায় এক সঙ্গে জ্বলে উঠেছে ইলেকট্রিক আলো। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাই সুকেশকে দেখে তর তর করে নিচে নেমে এসেছে।

পরিস্থিতি পরিবেশ নানা বিপদের মধ্যে মৃত্যুর গহ্বরে নিয়ে গেছে বটে সুকেশকে ভাবনা-চিন্তার মধ্যে দিয়ে। বাস্তবে নয়।

সুকেশ বেঁচে ফিরেছে। বাড়ির প্রত্যেকের আনন্দ হলেও ভর্ৎসনাও কম সহ্য করতে হয় নি তাকে। অজানা অচেনা পরদেশে রাতবিরেতে এভাবে হঠকারিতা তার ঠিক হয়নি। কুলিটি সৎ ছিল বলে ঠিক পথে পৌঁছে দিয়েছে। নকল হলে অসৎ হলে

সুকেশ যা যা ভেবেছে সবই সত্যি হয়ে যেত। এ নিয়ে এক বাক্যে হিতাকাঙ্ক্ষী আপনজনেরা নিঃসন্দেহ।

এখানে ঝুলনের যা ঘটেছে এই ঘটনার সঙ্গে তেমন মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ঝুলন মেয়ে। সুন্দরী। মিরাজ অজানা। নসিব অচেনা। তাদের রহস্যলোকের রহস্যময় মানুষই মনে হচ্ছে। কি ঘটেছে কি ঘটবে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

ঝুলনের বরাতে কি আছে কে জানে!

যাত্রা করার সময়—আসার সময় ঝুলনের মা—বনবীথি মাসি হাত ধরে বলে দিয়েছে, কুঞ্জা, দেখিস, ও বড় অন্যমনস্ক। নজরে নজরে রাখবি।

ঝুলন এখন কুঞ্জার নজরের বাইরে।

কি মুখ নিয়ে কুঞ্জা ফিরে যাবে কলকাতায়! কোন মুখে দাঁড়াবে মাসিমার সামনে!

কুঞ্জা ফিরবে না। ঝুলনকে না পেলে কুঞ্জারও এখানে শেষ। মান-সম্মান যাক, ক্ষতি নেই। ভয়, ভয় ঝুলনের জীবনের।

দু চোখে হাত চাপা দিয়ে ফোঁপাচ্ছে কুঞ্জা।

কান্নায় ভেঙে পড়ে মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছে, ঈশ্বর, তুমি রক্ষে কর। তুমি রক্ষে কর। আমার জীবন নিয়ে ঝুলনকে বাঁচাও।

আচমকা চমকে উঠেছে কুঞ্জা। কানের পাশে বজ্র গম্ভীর স্বরে চিৎকার।

কিছুতেই নয়। কিছুতেই নয়। কারও কোনো কথাতে নয়। যা ঘটনা ঘটে গেছে যথেষ্ট প্রমাণ। বল তার কোর্টে। কে রোখে একবার দেখব। আর দুনিয়া থেকে ঝুলনের চিরবিদায়।

দু কানে হাতচাপা দিয়েছে কুঞ্জা। বলে উঠেছে, তুমি কি মানুষ অঙ্কুর! নাকি নরখাদক বাঘ মানুষের খোলসে! তোমাকে চিনতে পারি নি আমি। ভুল করেছি। উকিল হলেই কি মানবতার রাজ্য থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে! মন বলে একটা বস্তু, সে-ও তোমার নেই।

ভুল। ভুল।

কুঞ্জার জীবনে তৃতীয় ভুল তুমি।

অঙ্কুর উদার মনের। অঙ্কুর অনেক আঘাত নিয়ে ফিরে এসেছে দিশার কাছ থেকে। যৎপরোনাস্তি নির্যাতন সইতে হয়েছে ওকে। স্নেহ মমতা সহানুভূতির দু হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কুঞ্জা। আ-হা-হা। একে বাঁচাতে হবে। একে দাঁড় করাতে হবে। সমাজে সংসারে সুযশ প্রতিষ্ঠার আসনে একে বসাতে হবেই হবে।

এ কোন অঙ্কুরকে দেখছে আজ কুঞ্জা! জল ভরা দু চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছে। সেদিনের সে অঙ্কুর কোথায়! নেই নেই।

এ অঙ্কুর?

নির্দয় নরপিশাচ।

দিশাই এর উপযুক্ত ছিল। ঝুলন ওর উপযুক্ত নয়।

কি এত দেখছ তুমি? যেন আমিই অপরাধী। তাই না?

তোমার মধ্যে এটা দেখতে চাওয়াও রীতিমত অন্যায় করা হবে। ওটুকু জায়গায় অত নিচে অত অন্ধকারে আমি নামতে চাই না। আমার মন নামুক তাও চাই না।

ছি ছি ছি। মানুষ! এমন মানুষ হয়! দয়া নেই মায়া নেই—একেবারে হৃদয়হীন। লোকে জন্তু-জানোয়ার পুষেও তার জন্যে একটু ভাবে, একটু চোখের জল ফেলে। পাথুরে হৃদয়। না, পাথুরে নয়। পাথর হলেও ফেটে যেত ঝর্নার জল উপচে পড়ে। ইস্পাত! কে জানে কোন ধাতুতে গড়া। বিধাতাই হদিশ দিতে পারে।

কুঞ্জা, আমি বুঝতে পারছি আমার মাথায় ঠিক নেই। মিথ্যে দোষারোপ আমার ওপর। আমার জায়গায় তুমি এলে বুঝতে পারতে মনের অবস্থাটা কি। বুক চিরে দেখাবার উপায় নেই।

তুমি যতই দোষ দাও আমার একথা আমি হলফ করে বলতে পারি, দিশা খোলামেলা মনের। তাকে জানা গেছে বোঝা গেছে সে কি চায় না চায়। সে কেমন। কিন্তু ঝুলন তা নয়। তাকে বুঝেও বুঝতে পারা যায় না। রহস্যের ঘেরাটোপে ঘেরা একটা মানুষ।

কুঞ্জার গলায় উত্তেজনা ফেটে পড়েছে। আঃ! অঙ্কুর, চুপ করো। চুপ করো। তোমার ঘ্যান ঘ্যানানি শুনতে আর ভালো লাগছে না।

এখন চুপ করে বসে থাকার সময় নেই। তুমি ফিরে যাও, না থাকতে পার।

কুঞ্জা কেবলি মনে মনে ভাবছে সুকেশের সবকিছু ধারণা যেমন ভুল হয়ে গেছে, ঠিক জায়গায় পৌঁছেছিল, তেমনি যেন হয় ঝুলনেরও। তার মনের ভয় যেন মিথ্যে হয়ে যায়। মিথ্যে হোক। মিথ্যে হোক। হে ভগবান, মিথ্যে হোক।

সিঁড়িতে গালে হাত দিয়ে বসে কুঞ্জা। দেহের সব শক্তি বুঝি চলে গেছে। মিরাজ এসে সামনে দাঁড়িয়েছে—বহিন, মত্ সোচনা। আমার বন্ধু নসিব খানদানি আদমি। সৎ লোক। খানদানের ইজ্জত রাখতে জানে।

কুঞ্জা এক দৃষ্টে তাকিয়ে। চেষ্টা করছে খুঁজে বার করতে, কোনো দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে কিনা চোখের তারায়। নসিবের সঙ্গে কোনো যোগ-সাজশ আছে কিনা।

থাকলেও চটানো চলবে না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা করতে হবে।

কুঞ্জার গলায় আকুল কান্না।—ভাইসাব, জরা মদত কিজিয়ে।

বহিনজি, জরুর জরুর।

নিজের হাত ঠেকিয়ে মিরাজ বলেছে, হর বখত্ এ গুলাম হাজির।

বাঁ পাশে অঙ্কুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠেছে কুঞ্জা—এখনও দাঁড়িয়ে কেন! দিলখোলা দিশার কাছে ফিরে যাও।

অঙ্কুর সরে গেছে বটে, কুঞ্জার 'দিলখোলা দিশা', কথাটা ভুলতে পারছে না। সাংঘাতিক একটা বিদ্রূপের চাবুক সপাং করে পিঠের ওপরে মেরেছে বুঝি।

দিশা মন খোলা লোক—এটা অসত্য নয়। সেটা মনে মনে ভালো রকম বুঝেছে অঙ্কুর। তার আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখেছে।

রাত দুটো।

জানলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচে বসার ঘরে। দিশা বাড়ি ফেরেনি এখনও। পাড়া-প্রতিবেশী জানতে পারলে কি বলবে, কি ভাববে। চুপি চুপি গেট খুলে ভেতরে নিয়ে আসতে হবে ওকে।

দিশার বাবা নিগম ব্লাড প্রেসারে ভুগছে। ডাক্তারের বারণ—কোনো রকমের অশান্তি উত্তেজনা যেন না হয় বাড়িতে। হলে বিপদ হতে পারে। ভেবে তখন কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকের সাবধান হয়ে থাকা উচিত।

বিপদ আক্রমণের থাবা উঁচিয়ে নিগমের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুযোগের অপেক্ষায়।

অপেক্ষা করছে অঙ্কুর। চুপি সাড়ে। দিশা যেন ফিরে আসে। কাকে বকে টের যেন না পায়।

অঙ্কুরের কথায় বিধাতাপুরুষ বোধহয় কর্ণপাত করে নি।

অন্য দিনের তুলনায় এ দিন হই হই রই রই কাণ্ড। দুটো ট্যাক্সি বোঝাই। পাঁচ-ছজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই নেশায় টর। দিশা একেবারে অচেতন। চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এসে মাতালদের চিৎকার—এ দরোয়ান, জলদি গেট খোলো। জলদি গেট খোলো।

লোহার গেটে ভারী তালা নেড়ে নেড়ে ঝন ঝন আওয়াজে পাড়া মাথায় করছে। পাড়ার যত ঘুমন্ত বাড়ির ঘুম ভেঙে গেছে মুহূর্তে। আলোয় আলোয় ছয়লাপ।

আপাদমস্তক জ্বলে উঠেছে অঙ্কুরের। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। লজ্জা মান—সব জলাঞ্জলি। কেলেঙ্কারির এক শেষ। বসার ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে অঙ্কুর। দিশার ছেলে বন্ধুরা বলছে, এ দরোয়ান, বুদ্ধু কা মাফিক খাড়া হ্যায় কিঁউ! জলদি যাও। জলদি যাও।

অঙ্কুর তো হতবাক। মুহূর্তে একজন পিঠে কিল বসিয়ে দিয়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে অঙ্কুর। আর একজন চুলের মুঠি ধরে তুলে বলেছে—কেয়া দেখতা হ্যায়।

যা, জল নিয়ে আয়। নখড়া মতকর।

দিশার আর একজন পুরুষ সঙ্গী সোফায় বসে কানে হাত দিয়ে ডান হাত সামনের দিকে ভাও দেখিয়ে গাইতে শুরু করেছে—'গাগরি ছলকে না যায় চল লো সামলে গোরি...'

জলের বালতি হাতে অঙ্কুর এসে দাঁড়াতেই একজন মাতাল এগিয়ে এসে অঙ্কুরের দুগালে দুই চুমু খেয়ে বলেছে, এ গোরি—মাইরি খুব ভালো তুই ভাই। দে দে, আমাকে দে। বহত তকলিফ কিয়া।

আর এক মাতাল চিৎকার করে বলেছে, গো গো গো। ওয়াটার ওয়াটার।

অচৈতন্য দিশা কার্পেটে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাতাল ছেলে বন্ধুরা কার্পেটেই জল ঢালছে। মাথায় এক ফোঁটা পড়ছে কি না সন্দেহ। অঙ্কুর ভয়ে থর থর।

এবারে এক মাতাল আঙুল তুলে লাগিয়েছে অঙ্কুরকে—ভালো ভাবে দেখবি মেমসাহেবকে। খবর্দার, যদি কিছু কাল শুনি যে সেবা করিস নি ভালো করে, তাহলে তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খাব।

মাতালদের যেমন দ্রুত প্রবেশ, তেমনি দ্রুত প্রস্থান।

এতক্ষণে ওপর থেকে নেমে এসেছে নিচে নিগম আর দিশার মা শ্রুতিদেবী। ঘরে ঢুকেই তুলকালাম কাণ্ড। তারস্বরে চিৎকার শ্রুতিদেবীর। একে ভারী দেহ তার ওপর গলার তীক্ষ্ণ তীব্র আওয়াজ। কখনও চড় তুলছে কখনও ঘুষি পাকাচ্ছে কখনও অঙ্কুরের মুখের কাছে আঙুল নেড়ে নেড়ে বলছে, আপদ কোথাকার! জংলি ভূত যাকে বলে। আ মোলো যা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি! দিশাকে তোল। বিছানায় শুইয়ে দে ভালো করে। যার বাড়ি তার বাড়ি নয়, নেপোয় মারে দই!

নিগম আস্তে আস্তে বলেছে, আহা, চুপ করো শ্রুতি! লোকে শুনলে বলবে কি! তুমি তো লোককে আরও জানিয়ে দিচ্ছ কেলেঙ্কারিটা।

খবর্দার! আস্পর্দা দেবে না বলছি। কোমরে দু হাত দিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে শ্রুতিদেবী নিগমের দিকে।—দু দিন বাদে তো মরতে হবে তোমাকে। মেয়ে নিয়ে বাঁচতে হবে আমায়।

খুব চাপা গলায় আস্তে আস্তে বলেছে নিগম, শ্রুতি, একটু সংযত হও। দিশাকে ভালো করে মানুষ করে তোলো। অনেক আশা ছিল আমার। সব জলাঞ্জলি। সব শেষ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে নিগম।

শ্রুতিদেবীর চিৎকার থামে নি।—ওরে আমার রে! জলাঞ্জলিঅলারে! কোথা থেকে এলেন উনি উপদেশ দিতে! শাট আপ। মেয়েকে তৈরি করেছি ভালো করেই তৈরি করেছি। এ জগতে এ যুগে বাঁচাতে গেলে এইভাবেই চলতে হবে। না হলে

বাঁচা যাবে না। মাতাল দাঁতাল গুণ্ডা বদমাইশ—সবাইকেই হাতে রাখতে হবে। মেয়ে যা করছে ঠিকই করছে। এতটুকু ত্রুটি দেখছি নে। অ্যাঁ—অ্যাঁ—আবার শিক্ষা দিতে এসেছে। কি করে যম ভুলে থাকে এসব লোককে জানি নে। দাসী-বাঁদি পেয়েছে নাকি আমাদের! সাত জন্মের তপস্যায় আমাকে পেয়ে উদ্ধার হয়ে গেছ। আমার মেয়েকে দাসী-বাঁদি হতে আমি দেব না—এই বলে দিলুম। এ বাড়ি আমার। কারও কোনো কথা চলবে না। আমার বাড়ি মানেই দিশার। কে কি বলছে! কে কি দেখছে, কি এসে যায় আমার! কারও ভাতি, না কারও ঘরি!

সারা শরীর কাঁপছে নিগমের। ধরে সোফার ওপর শুইয়ে দিয়েছে অঙ্কুর। শ্রুতিদেবী মুখ ভেঙচে বলেছে, আদিখ্যেতা আদিখ্যেতা! সোহাগ, দরদী! থাকলে বাঁচি সইলে বাঁচি।

এ দিনের এই ঘটনার পর থেকে আরও বেশি করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে নিগম। কিছু বলতে চেয়েছে। কিন্তু বলতে পারে নি। কিছু করতে চেয়েছে, করতে পারে নি। কাছে বসতে দু চোখ জলে ভরে উঠেছে শুধু। দুটো ঠোঁট নড়ে ওঠার সঙ্গেই সঙ্গেই বাঘিনীর মতো ঘরে ঢুকেছে শ্রুতিদেবী। ফাঁক পেয়েছে কি ঢুকে পড়েছে। —অঙ্কুর, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। একদম কাছে যাবে না। ওর উত্তেজনা বাড়াবে না।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে অঙ্কুর।

এত অপমান এত লাঞ্ছনা—সবই সহ্য করেছে অঙ্কুর একটা জিনিস ভেবে। সেটা কৃতজ্ঞতা।

ছোটবেলায় মা-বাবার কাছ থেকে শুনে এসেছে বরাবর মানুষের উপকার মনে রাখবে। কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে চিরকাল। ভুল যেন না হয় কখনও। এটাই মানুষের ধর্ম। তাদের বংশের মহাসম্পদ। সুনাম। সেই আবহাওয়ায় অঙ্কুরের মন গড়ে উঠেছে।

কোর্টে প্র্যাকটিস করছে বেশ কিছুদিন। একটা খুনের কেসের আসামীকে বেকসুর খালাস করিয়ে আনার পর থেকে নামটা ছড়িয়ে পড়েছে।

আসামী যখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, বিচার জেরা জজের মন্তব্য অপর উকিলের মন্তব্য শুনতে শুনতে অঙ্কুরের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠেছে আসামীর দু চোখের দিকে তাকিয়ে। একি দেখছে সে! এ কি দেখল! বড় করুণ বড় অসহায়। ধীরে ধীরে ঐ দু চোখ কথা কয়ে উঠেছে—আমি দোষী নই। ধর্মাবতার আমি নির্দোষ। উকিলবাবু, আমায় মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

অঙ্কুর দেখেছে ধীরে ধীরে দু চোখের তারা নিষ্প্রাণ হয়ে উঠেছে। জীবন্ত লোকের

দেহে মৃত মানুষের চোখ যেন।

আপ্রাণ চেষ্টা করেছে আসামীকে বাঁচাবার জন্যে। নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করেছে। রাতের পর রাত জেগেছে আর বসে বসে ভেবেছে। চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে কপালে।

চিন্তা চেষ্টা সাধনার ফল ফলেছে। অঙ্কুরকে লুফে নিয়েছে অ্যাডভোকেট নিগম। হাত ধরে অভিনন্দন জানিয়েছে।

নিগম বর্ধমানের মানুষ। তার অঙ্কুর ঐ দেশেরই ছেলে।

অঙ্কুর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে গেছে। তার বাড়ি থেকেই প্র্যাকটিস করবে।

অঙ্কুর একদিন তার দেশের গৌরব হয়ে উঠবে।

সেই থেকে বসবাস দিশাদের বাড়িতে অঙ্কুরের।

যা কিছু সুনাম যা কিছু সুযশ যা কিছু প্রচার—সবই নিগমের জন্যে অঙ্কুর কৃতজ্ঞ। চির কৃতজ্ঞ।

কোনো দিনই এদের ছাড়া চলবে না। এ বাড়ি ত্যাগ চলবে না। মা বাবারও আদেশ তাই। শ্রদ্ধেয়কে যে শ্রদ্ধা করতে পারে, সেই শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত। পায়ও।

দিশার আচার-ব্যবহারে দিনের পর দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে অঙ্কুর। নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করে। গায়ে যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। ব্যায়াম করা সুঠাম অঙ্গ। মারপিট করতে যে জানে না, তা নয়। রীতিমত জানে। একাই দশ জনকে রুখতে পারে। ক্যারাটেও জানা আছে কিছু কিছু।

সবচেয়ে বেশি আপসোস সব থেকেও সব নেই যেন তার। স্রেফ কৃতজ্ঞতার সোনার শেকলে মন প্রাণ হাত পা কঠিন বাঁধনে বাঁধা।

এদের মান-ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব অঙ্কুরের। দিশাকে ভালো করার দায়িত্ব। চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু হচ্ছে না। কিচ্ছু করা যাচ্ছে না। শাসন বকাবকিতে ও মেয়ে সাপিনীর ফণা ধরে গর্জে উঠেছে। সে পথ বেছে নিতে পারবে না অঙ্কুর কোনো মতেই।

কি ভাববে লোকে! যদিও পাড়া-প্রতিবেশীর জানতে বাকি নেই দিশার কীর্তি-কলাপ। তবুও আর কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে লাভ নেই। সেটা চায়ও না অঙ্কুর।

অঙ্কুর ভালো রকমই জানে নিগম আর অঙ্কুরের ওপর দিশার রাগটা কোথায়।

বাঙ্গালোরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে দিশা বেলেল্লাপনার জন্যে প্রথম বলতে হবে। হস্টেল পছন্দ করে নি, বিদায় দিয়েছে। কলেজ সহ্য করতে পারে নি। ত্যাগ করেছে।

নিগম আর অঙ্কুর নিয়ে আসতে গিয়ে কি হয়রানি কি পরেশানি!

বাঙ্গালোর ছেড়ে আসবে না দিশা। তার নানা দেশের প্রেমিকরাও তাকে ছাড়বে না। অনেক হাঙ্গামা হুজ্জোত পুলিশ করে দিশাকে আনা হয়েছে শ্যামবাজারের বাড়িতে।

কলকাতায় আসার পর ক্রমে দিশা ভয়ঙ্কর থেকে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। কি উগ্র মূর্তি! চোখে আগুন। নিশ্বাসে তাপ।

নিগম অঙ্কুরকে অনুরোধ করেছে যে কোনো উপায়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে দিশাকে শান্ত কর। সভ্য ভদ্র করে তোল। পারলে এক তুমি-ই পারবে। আমার ক্ষমতার বাইরে।

আমি কিছু বলতে গেলে মুখে মুখে কি উত্তর। বেশ করব। খুব করব। তোমাদের মুখে চুনকালি দেব। কেন এনেছ। ফলভোগ করতেই হবে। ঘর ছাড়া করব। পাড়া ছাড়া করব। যাও বা রাত্তিরে বাড়ি ফিরি এবার সারা রাত বাইরে কাটাব। ঐ গুণ্ডা অঙ্কুরটাকে পুষছ আমায় জব্দ করার জন্যে! আমি কি কিছু বুঝি না! সব বুঝি। এবার দেখাচ্ছি মজা।

হাতের মুঠো উঁচিয়ে, হিলঅলা জুতো ঠক ঠক করে ঠুকে চিৎকার করে বলে উঠেছে, আমি একাই একশো। তবু জেনো পেছনে আমার অনেকেই আছে। ভেবনা একা আমার বন্ধুদের এনে হাত পা ভেঙে গুঁড়ো করে দেব। ভেবেছ ঐ হনুমানটার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে তুমি! হিলঅলা জুতো মেঝেয় ঠক ঠক করে ঠুকতে ঠুকতে বলেছে, লাথি লাথি। মুখে লাথি।

লাফিয়ে উঠেই জোরে মেঝেয় পা ঠুকে বলেছে, এই জোড়া পায়ের লাথি।

শ্রুতিদেবী মেয়ের গলায় আওয়াজ শুনে ভিজে কাপড় গায়ে মাথায় জড়িয়ে দৌড়ে এসেছে বাথরুম থেকে। দু চোখ পাকিয়ে বলেছে, কি হয়েছে কি হয়েছে! তারপর নিগমের দিকে তাকিয়ে বলেছে—সাক্ষাৎ নারদ মুনি এলে জুটল আমার ভাগ্যে! বিশবার বলেছি, ওকে উত্তেজিত ক'র না। ডাক্তারের কারণ। বিশাল হার্টের অসুখ হয়ে যেতে পারে।

দিশা আদুরে কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠেছে। মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, মাম, এরা আমায় মেরে ফেলবে। বাবু আর অঙ্কুর। আমাকে বাঙ্গালোর পাঠিয়ে দাও।

যেটুকু চাপা কান্না ছিল সেটুকু জোরে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

চিৎকার করে কাঁদছে দিশা।—বাঁচাও বাঁচাও বাঁচাও। কে কোথায় আছ শিগগীর এস। আমাকে মাকে বাঁচাও। অঙ্কুর গুণ্ডা আর নিগম আমাদের মেরে ফেলেছে।

নিগম হতভম্ব হতবাক। দাঁড়িয়ে আছে একখানা পাথর-মূর্তি।

ওপরের হল্লাগুল্লা শুনে অঙ্কুর এসে হাজির। দেখেশুনে সেও যেন কেমন হয়ে

পড়েছে। এও হয়! এও সম্ভব! মেয়ে হয়ে লোক ডাকতে পারে নির্দোষ বাবার বদনাম দেয়ার জন্যে! ভাবা যায় না।

আশপাশের বাড়ির লোকেরা ছুটে এসেছে। গেটে ঝাঁকুনি।—শিগগীরি খোল। শিগগীর-ই খোল।

বাইরের লোকের গলার আওয়াজে দিশার কান্নার চিল-চিৎকার আরও বেড়ে গেল চতুর্গুণ।

যারা এসেছে তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলেছে, আহা-হা হা—মেয়েটাকে মেরে ফেললে বুঝি রে। গেট ডিঙিয়ে চ। লাফিয়ে পড়ি ভেতরে। আজকাল তো অনেকেই একটু-আধটু খায়। খেয়েছে তো কি হয়েছে! তাই বলে কি মেয়েটাকে মেরে ফেলতে হবে। কি নিষ্ঠুর এরা!

কেউ কেউ বলেছে, গেট টপকে ভেতরে লাফিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না। উকিলের বাড়ি। ট্রেসপাসার্স কেস হয়ে যাবে। ফিরে চ। ফিরে চ।

কেউ কেউ হাসতে হাসতে ব্যঙ্গ করে বলেছে আবার, চ দিকি নি। মাতালস্য নানা ভঙ্গি। মেয়েটার উৎপাতও যথেষ্ট। কাঁহাতক সহ্য করবে বাবা মুখ বুজে! রোজ রাত্তিরে এসে যা উৎপাত করে মেয়েটা, আর যে-সব নাটকের দৃশ্য হয়, আশপাশের সব বাড়ির ছেলেমেয়েরা এবার জাহান্নামে যাবে। মেরে ফেলছে! আহা-হা-হা! এসব ন্যাকামি। ন্যাকামি।

বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখেছে অঙ্কুর। গেট ফাঁকা।

নিগমকে ধরে ধরে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসেছে।—আপনি নিচেই থাকুন। ওপরে উঠবেন না আর। ওপরে উঠলেই কথায় কথা বাড়বে।

কাঁপা গলায় নিগম বলেছে, বাবা, তোমারও অনেক খোয়ার হয়েছে। অনেক মিথ্যে অপপ্রচার। এসব আমার জন্যেই তো। আমি যদি না নিয়ে আসতুম তোমায়...

গলা ধরে গেছে নিগমের। আর কোনো কথা বেরয় নি মুখ দিয়ে। দু চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে।

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখ মুছিয়ে দিয়ে পাশে বসে বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে অঙ্কুর, মেসোমশাই আমি ঠিক আছি। আমার জন্যে ভাববেন না। দিশার আক্রোশ আমাদের ওপর ক-দিন, দেখুন না। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

দিশার সঙ্গে ক-দিন নিগম আর অঙ্কুর কোনো কথা কয় নি। শান্ত হোক। ভালো ভাবে বোঝান যাবে।

শান্ত হয় নি দিশা। আগ্নেয়গিরির আগুন ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে।

তার চিৎকারে কান্নায় কেউ আসে নি সাহায্য করতে। সমস্ত এই গুণ্ডা অঙ্কুরের কারসাজি। সকলকে তাদের নামে বুঝিয়েছে। নিজেরা সাধু সেজেছে। এর প্রতিশোধ না নিয়ে নিষ্কৃতি নেই দিশার। নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। পারবে না। পারবে না।

সেদিন হোলি।

রঙে রঙে ছড়াছড়ি।

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হোলি খেলতে বেরিয়েছে দিশা। পরনে প্যান্ট-শার্ট। কাঁধের ব্যাগে নানা রঙের আবির।

সারা দিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই দিশার। শ্রুতিদেবীকে ফোনেতে দিশা কি সব কথা বলতে শ্রুতিদেবীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে। বিজয়ীর উল্লাস। তারই আভাস যেন।

তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সারা দিন হোলি খেলার পর পাড়া-ঘর নিঝ্‌ঝুম। দূরে বস্তি থেকে নানা বিকৃত গলার আওয়াজের গান ভেসে আসছে।

বরসানে হোলি হ্যায়

চলিয়ে শ্যাম রায়...।

জোরে জোরে ঢোল-করতালের আওয়াজ।

ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে গেটের সামনে।

জনা চারেক যুবক রঙে রঙে রঙিন হয়ে নেমেছে গাড়ি থেকে। সামনে দিশা। চেনা দায়। বাঁদুরে রঙে মুখখানা কিম্ভূতকিমাকার।

সিঁড়ি বেয়ে রোয়াকে উঠেই বসবার ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা। ধাক্কার পর ধাক্কা। ধাক্কায় ধাক্কায় ভেতরের অঙ্কুরের গলার 'যাচ্ছি যাচ্ছি' আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছে। কে কার কথা শোনে!

দরজা খুলতেই চার জনে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে অঙ্কুরের ওপর। অঙ্কুর একটু ঠেলাঠেলি করে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেই দিশা এসে ঠাস ঠাস করে দু গালে দুই চড় বসিয়ে দিয়েছে। বলে উঠেছে, এই দোদানা, এই নিকুনা, এই মনবোঝ, এই ছলন—আচ্ছা করে পিটিয়ে ওর হাড়গোড় ভেঙে দে। বাঙ্গালোর থেকে ঐ নিয়ে এসেছে আমায় জোর করে।

মাতালদের মধ্যে একজন অঙ্কুরের দিকে তাকিয়ে উঠে বলেছে, আজ হোলি খেলা। দোস্ত, তোকে ভালো করে রঙ মাখিয়ে তবে ছাড়ব।

একজন হাত নেড়ে কোমর দুলিয়ে, পুরনো দিনের অভিনেত্রী কুসুমকুমারীর

‘দোললীলা’-র একটি রেকর্ডের গান গাইতে শুরু করে দিয়েছে। চারজনে হাততালি দিচ্ছে। আর দিশা সেই গান হাততালির তালে তালে নিজেও হাততালি দিতে দিতে গাইছে আর নাচছে। শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে, হাত ছুঁড়ে পা ছুঁড়ে, লাফিয়ে, এর ঘাড়ে পড়ে, তার বুকে পড়ে।

কেন রঙ দিলি ঢঙ করে
শাদা কাপড় রাঙিয়ে দিলি
রঙের পিচকিরি মেরে.....

মাঝখানে অঙ্কুর দাঁড়িয়ে। চার দিক দিয়ে দিশা আর তার চার মাতাল বন্ধু ঘুরছে। আর খানিকটা করে আবির তুলে ওকে চড়চাপাটি মারছে।

সহ্যের সীমার বাইরে।

এখনও কি কৃতজ্ঞতা!

রবি ঠাকুরের কথা কানে বেজে উঠেছে অঙ্কুরের।

‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে’

কৃতজ্ঞতা কাদের জন্যে? যারা কৃতজ্ঞ।

এদের জন্যে নয় নয় নয়। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরের রক্ত চনমন করে উঠেছে। বুকে আগুন মাথায় আগুন। বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি ফুলে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি।

নিজের অজানতেই হাত-পা চালিয়েছে। ক্যারাটে। এধার-ওধার ছিটকে পড়েছে মাতালরা। পড়ে গিয়েই উঠে দৌড়ে পালিয়েছে। পড়িমরি করে গিয়ে বসেছে গাড়িতে।

গাড়ি স্টার্ট করার পর বলে উঠেছে, দেখে নেব। দেখে নেব। আবার আসছি।

অঙ্কুরের রণমূর্তি দেখে নেশা ছুটে গেছে দিশার। দৌড়ে ওপরে উঠে গেছে মায়ের কাছে।

এতবড় অপমান! আমার বন্ধুদের মেরেছে অঙ্কুর। ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে। এ অপমান বরদাস্ত করতে পারব না আমি। কিছুতেই না। কিছুতেই না।

চুপি চুপি পায়ে পায়ে নিচে নেমে এসেছেন শ্রুতিদেবী। ভেতরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরেই চমকে উঠেছে। অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—আঁ আঁ আঁ।

অঙ্কুর এক ভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। অচল-অটল। পাঞ্জাবি ছিঁড়েছে। ছিঁড়েছে পাজামা। বুক দিয়ে গা দিয়ে রক্ত ধরছে।

রাক্ষস রাক্ষস রাক্ষস। চেনা যায় নি অঙ্কুরকে। রাক্ষসকে এ বাড়িতে রাখা চলবে না। নিগমের কাছে এসে অভিযোগের পর অভিযোগ করে গেছেন শ্রুতিদেবী।

কী ভীষণ মূর্তি! ওর হাতে দিশাকে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করছ! আমার মেয়েকে মেরে ফেলবে। যে কোনো উপায়ে ওকে এবাড়ি থেকে বার করার ব্যবস্থা কর। না হলে তুলকালাম কাণ্ড করব। কেঁদে কূলকিনারা পাবে না। তোমাদের কোনো শক্তিই আমাকে আটকাতে পারবে না।

এর প্রতিশোধ নেবই নেব। মেয়েকে অপমান! মেয়ের বন্ধুদের গায়ে হাত! কার আশকারায়? তোমার তোমার তোমার।

মেঝেতে পায়ের গোড়ালি ঠুকে ঠুকে আবারও বলেছে শ্রুতিদেবী, তোমার তোমার তোমার।



মা-মেয়েকে লুকিয়ে ভোর সকালে আস্তে আস্তে নেমে এসেছে নিচে নিগম—অঙ্কুরের ঘরে। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে মাথার কছে বসেছে। খাটটা একটু নড়ে উঠেছে।

তাকিয়েছে অঙ্কুর। চোখ লাল।

কপালে হাত দিতেই চমকে উঠেছে নিগম। জ্বর। বুকে গায়ে হাত রেখেছে। আগুন। পুড়ে যাচ্ছে গা।

কাজের লোক নিতুয়াকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে নিগম বলেছে, মাথায় জ্বল ঢাল।

অঙ্কুরের মুখ দিয়ে অনর্গল ভাবে বেরিয়ে আসছে—কৃতজ্ঞের কাছে কৃতজ্ঞতা। অন্যায় যে করে...।

খানিক পর নিচে নেমেছে শ্রুতিদেবী। —আমার কাজের লোককে দিয়ে কোনো কাজ করান যাবে না। হাসপাতাল তো রয়েছে। দরদীরা সেখানে এখুনি ভর্তি করে দিক। রাক্ষস-খোক্কসদের সেবা করে বাঁচিয়ে তাদের কামড় খাব, সে বান্দা আমি নই।

কোনো উপায়ান্তর না দেখে বাড়ির অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। নিগম তার প্রিয় অঙ্কুরকে নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে।

নার্সিং হোমে রোজ একবার করে দেখতে আসে নিগম। দিশা শ্রুতিদেবী একেবারে নিষেধের গণ্ডী দিয়ে রেখেছে বাড়িতে। এ বাড়িতে অঙ্কুরের প্রবেশ নিষেধ। ভালো হয়ে উঠছে যখন, যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক, তাদের দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই। মরুক বাঁচুক জানবার দবকার কি! নিগম যদি বেশি আকুলি-বিকুলি করে তার পুষ্যিকে নিয়ে নিগমও তার সঙ্গে থাকতে পারে। জানিয়ে দেয়া হচ্ছে নিগমের জন্যে এ বাড়ির দরজা বন্ধ। কিছুদিনের জন্যে নয়, চিরকালের জন্যে।

নিগম পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি অতিথি আলয়-এ থাকার ব্যবস্থা করেছে অঙ্কুরের। নার্সিং হোম ছেড়ে দিলে ওখানে ওকে রাখবে। ভালো জায়গা। বহুদিন ধরে অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করে যাচ্ছে। সকলে যেন একই পরিবারের।

অঙ্কুরের নার্সিং হোম থেকে আনার এক দিন আগে একটা বিচ্ছিরি রকমের ঘটনা ঘটে গেছে। বিকেলে নিগম গিয়ে দেখে অঙ্কুর খাটের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

কেন, কী ব্যাপার?

সিস্টাররা বলেছে, পেশেন্ট যে পাগল একথা বলা উচিত ছিল আগে আপনার।

অবাক নিগম।

পাগল যে নয় তাকে কেমন করে পাগল বলা হবে? গলায় উত্তেজনা।

পেশেন্টের বাড়ির আত্মীয়-স্বজন ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন—যেন উঠতে না 'দেয়া হয়। বেঁধে রাখা হয়। কোথাও চলে গেলে নার্সিং হোমকে দায়ী করবে।

কথা না বাড়িয়ে, প্রশ্নোত্তরের মধ্যে না গিয়ে বন্ড সই করে অঙ্কুরকে নিয়ে এসেছে নিগম অতিথি আলয়ে।

মালিক বনবীথির হাতে তুলে দিয়ে বলেছে, আপনাদের ছেলে। খুব ভালো ছেলে। আমি নিশ্চিন্ত। একে একটু দেখবেন।

মৃদু হেসেছে বনবীথি।



সাজান গোছান একটা সুন্দর ছিমছাম বাড়ি। বাড়ির মধ্যে ঢুকলে কিন্তু একদম মনে হয় না বাইরেটা শহর। যেন পাহাড়ের চুড়োর ওপর একটা বাংলোয় বসে থাকা।

এক আধ জনের নয়, যে কেউ আসুক না কেন, এই পরিবেশ তাকে ভাবিয়ে তুলবে। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ভাবনা-চিন্তায় তলকূল খুঁজে পাবে না সে।

নিজেকে ভুলে যেতে হয় নিজেকে হারিয়ে যেতে হয়।

এ যেন নরক গুলজার করা মর্তের মধ্যে স্বর্গের নন্দনকানন।

এখানে যারা বসবাস করছে এরা নানা প্রকৃতির নানা দেশের। নানা চেহারার নানা ভাষার। তবু একটি সুরের সুতোয় নানা ফুলে গাঁথা সুন্দর মালা একটি। প্রায় একাত্মা এক মন। হাসিখুশি ন্যায়-অন্যায় মান-অভিমান এখানে পুণ্য-পবিত্র বাতাসে বয়ে বেড়ায়।

বিচ্ছেদের বালাই নেই। আছে মিলনের মেলা। ছোট-বড় কাজের লোকরাও একই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। একজনের দুঃখে এরা সবাই দুঃখী। একজনের সুখে এরা সবাই সুখী। এ এক অন্য দুনিয়া।

প্রথম প্রথম সত্যি সত্যি মনে হয়েছে অঙ্কুরের স্বপ্নের রাজ্যে স্বপ্নের ঘর-বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। স্বপ্নের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেলা করছে। সব কিছু বাস্তব অথচ বাস্তবের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভাবতেও বিস্ময়।

দিশাদের বাড়িরে শরীর মনে কম নির্যাতন পোহাতে হয় নি। দেহের ক্ষত শুকিয়েছে। দাগ মেলায় নি এখনও। মিলিয়ে যাবে।

মনের ক্ষত?

সারবে না সারবে না সারবে না। এক রকম চিৎকার করেই বলে ফেলেছে।

ভুলতে পারবে না পারবে না পারবে না। ভোলা উচিতও নয়। গাধার বোকামি করা হবে।

অঙ্কুরের চিৎকার শুনতে পেয়েছেন সামনের ঘরের সৎময়জি। বুড়ো মানুষ। দৌড়ে এসে হাঁপাচ্ছেন। কাছে এসে অঙ্কুরের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে বুকে মাথায়

হাত বুলোতে বুলোতে স্নেহঝরা কণ্ঠে বলেছেন, বাবা আমার, কি পারবে না? অতীতকে ভুলতে পারবে না? কবর খুঁড়ে লাভ কিছু কি আর আছে? সুন্দর দেহ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেবল পচা গলা মাংস আর হাড় কখানা। ভুলে যাও। আমরা তো আছিই।

টেবিলের ওপর থেকে জলভরা গেলাসটা তুলে নিয়ে এসেছেন সৎময়জি।

একটু খাও বাবা। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

এক ঢোক খেয়েছে অঙ্কুর। সৎময়জিকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে।

কপালে চুমু খেয়ে সৎময়জি বলেছেন, তুমি শান্তি পাও। শান্তি পাও।

অঙ্কুরের মনে হয়েছে তার মৃত বাবাই বুঝি ফিরে এসে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। ভালোবাসার ছোঁয়া দিয়ে গেছে।

ঘুম ঘুম ঘুম।

ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে অঙ্কুর।

ঘুমটা হালকা হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। একটু সুন্দর মিষ্টি বাজনার আওয়াজ আসছে না! কিসের বাজনা? তারের? হ্যাঁ গিটারই তো। সুরটা একটু অন্য ধরনের। জাপানিদের গানের সুরের মতো। জাপানের গান। মায়ের ব্যথার গান। বিদেশে প্রবাসী সন্তানের মনে পড়ছে। শীতে ছেলেমেয়ে কষ্ট পাবে। তাই মা আগুনের তাপ নিতে নিতে বুনে দিয়েছে সোয়েটার। বুনে দিয়েছে গ্লাভস। বড় সুন্দর লাগছে। ব্যথা-বেদনার মধ্যে দিয়ে পুরো গড়ে উঠছে একটি আপাদমস্তক স্নেহ দিয়ে গড়া স্নেহময়ী জননীর ছবি। সে ছবি শুধু চাঁদনির একা মায়ের নয়, দূরবাসী সব ছেলেমেয়েরই মায়ের পূর্ণ ছবি।

ঘুমের ঘোর এখনও অঙ্কুরের দুচোখ জুড়ে। এ গানও তো তার একটা ঘুম।

খাটে উঠে বসেছে। কান পেতে শুনছে গান।

কাসাঙ্গো ইয়োনা বে ওসিতে
তেবুকুরো আনড়েকুরে তা
কোগারাসি ফুইচা স্যমেতাকারোতে
সেত্‌সেতো আন্‌দা-দা য়ো
ফুরুসাতো নো কাওরিগা তো দো ক্যু
ইরোরিনো নিওইগা সিতা

জাপানি শেখানোর ক্লাসে পড়িয়ে বাড়ি ফিরে নিজের কাজকর্মে মন দেয় চাঁদনি।

ঘুমোবার আগে হাঁটু মুড়ে বসে গিটার হাঁটুর ওপর রেখে তারে তারে সুর তোলে

আঙুলের ছোঁয়ায়।

সরু মিষ্টি গলায় গান ধরে। মাকে মনে করে। দেশকে মনে করে। দেশের মাটি গাছপালা ফুলের গন্ধ ওকে ঘিরে ধরে। বুকের ওঠানামাটা নদীর ঢেউ।

চাঁদনির কাছে এটা স্তব। এটা প্রার্থনা। মাকে মনে পড়াটাই তার সাধনা।

ধর্মকর্ম করতে এসেছে চাঁদনি—জাপানি মেয়ের বাংলা নাম। সুযোগ মেলেনি মনোমত হয় নি। শেষে বাঙালি ছেলে সুশোভনকে বিয়ে করে সংসারী।

ভালো লাগে। এখানে সবই তো নতুন অঙ্কুরের কাছে। নতুনের স্বপন দেখে বারে বারে। আবার চোখে ঘুমের পশরা নেমে আসছে।

স্বপ্ন দেখার মতো মনে পড়ে যাচ্ছে ঠাকুরদার কথা। জাপানিদের প্রকৃতির সঙ্গে যত্নআত্তির সঙ্গে আদর-আপ্যায়নের সঙ্গে অর্ধেক মিল আমাদের।

ঠাকুরদা বলেছে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। ভাবা যায় না।

যতটুকু মনে পড়ে বোধহয় দিলীপ রায়েরই জাপান সফরের সময়কার ঘটনা। ভারত সরকারের সঙ্গীত মিশনের প্রতিনিধি হয়ে গেছেন। এক জাপানি ভদ্রলোকের নেমন্তন্নে তাঁর বাড়িতে উঠেছেন। জামা-কাপড় ছাড়ার ঘরে নিয়ে গেছেন প্রথমে ভদ্রলোক অতিথিকে। বাইরের জামা-কাপড় ছাড়িয়ে হলুদ সিল্কের জ্বলজ্বলে কিমানো পরিয়ে দিয়েছে। পায়ে হলুদ ভেলভেটের চটি।

ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে আসনে বসিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে অতিথিকে আদর-সম্মান দেখিয়েছে। কেটলির ফুটন্ত জলে কাপ ধুয়ে সিল্কের আসন ঢাকা চৌকির ওপর রেখেছে। গরম জল ঢেলে সবুজ চা তৈরি করে দু হাতে করে অতিথির সামনে ধরছে।

চা খেয়ে অতিথি খুব খুশি। বিদায়-পর্বে কাঠের পালিশ করা বাংলো বাড়ি থেকে ফুল গাছের কেয়ারি পেরিয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছেন অতিথি।

হেসে বলেছেন, এ স্মৃতি ভোলবার নয়। সৌভাগ্যের স্মৃতি। চিরদিন মনে রাখার স্মৃতি।

বাড়ির মালিক বলেছে, আজ আমাদের বড় দুর্দিন।

চমকে উঠেছেন অতিথি, কি দুর্দিন?

আমাদের একটি মাত্র ছেলে আজই মারা গেছে।

কোথায়? অতিথির গলায় বিস্ময়।

এখানে। এই বাড়িতে পাশের ঘরে।

সে কি! একটুও জানান নি। এত কষ্ট বুকে চেপে রেখে এত আদর-আপ্যায়ন!

আপনি অতিথি। নিজেদের কষ্ট জানিয়ে আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি আমরা।

আধো-জাগা আধো-ঘুম এইরকম আবস্থা অঙ্কুরের।

একটা আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন ভাব। ঠাকুরদার মুখে শোনা কথা বুঝি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে অঙ্কুরের চোখের সামনে।

দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখছে অঙ্কুর।

সেই সঙ্গে রবি ঠাকুরকেও উদাহরণ হিসেবে ঠাকুরদা তুলে ধরেছে অঙ্কুরের সামনে।

অমিয়া ঠাকুরের মুখে শুনেছে ঠাকুরদা। খুড়োমশাই রবি ঠাকুর অমিয়া ঠাকুরের বাড়িতে আসার কথা। সন্ধে ছটা। মেয়েদের নিয়ে একটা সভা।

সময়ের মানুষের সময় চলে যাচ্ছে। অথচ আসছেন না, সকলে ঘর-বার করছে।

এদিকে কখনও ছটা বেজে গেছে।

ঘোড়ার গাড়ি গেটে ঢোকার আওয়াজ। কোচোয়ান বেল টিপছে। টং টং টং। মেয়েরা এসে সব হাজির গাড়ির সামনে।

রবি ঠাকুরের গলায় বিনয়। দেরি হয়ে গেছে। বেলার শেষ কাজটা শেষ করে এসেছি। বড় মেয়ে মাধুরীলতার মৃত্যুর পর।

কথা শেষ হতেই ঠাকুরদা জোরে নিশ্বাস ফেলেছে। অঙ্কুরের মাথায় হাত দিয়ে বলেছে, সহ্য করতে শেখ। ধৈর্য ধরতে শিখ। দুঃখ কষ্ট মৃত্যুকে তুচ্ছ করে কর্তব্য কর্মে এগিয়ে যাবে। ত্রুটি রাখবে না। নিজের ব্যথাবেদনার অংশ অপরকে দিতে চেষ্টা কোরো না। অপরকে দুঃখী করে তুলতে চেও না।

গালে বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে ঠাকুরদা বলেছে, মনে রেখ ভাই। আমাকে ভুলে যাও সেও ভালো। কথা যেন মনে থাকে।

কখন ভোর হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি অঙ্কুর।

পোষা কোকিলের কু-কু-কু-উ ডাকে উঠে বসেছে। দুচোখ রগড়ে বারান্দায় বেরিয়ে দেখেছে আকাশে লাল আভা। সূর্য উঠি উঠি।

অতিথি-আলয়ের লনে সুন্দর বাগান। নানা ফুলে ছয়লাপ। রঙ বাহারি প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা দুটো নয়। অনেক অনেক।

মনোরম দৃশ্য। শান্ত দখিনা বাতাস। মধুর সুবাস।

প্রাণে মনে বসন্তের ছোঁয়া।

কিন্তু হায়! অঙ্কুরের জীবনে বসন্ত তো হারিয়েই গেছে। দিশাকে নিয়ে যা কাণ্ডকারখানা! পুরনো দিনের একটা গানের কথাই কেবল মনে পড়ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গলা খাদে নামিয়ে অঙ্কুর গাইছে। গানটা কি এই সময়ে গাওয়া যুক্তিযুক্ত হচ্ছে?

কাকে শোনাচ্ছে এ গান?

'পূর্ণ হৃদয় মম ছিল যে গো
কেন আচম্বিতে অজ্ঞাতসারে
শূন্য হইয়া উহা গেল যে গো
মনের ভিতর হতে কি যেন চলিয়া গেছে
শূন্য তাহারই মাঝে কি অভাব রহিয়া গেছে
খুঁজিয়া দেখিনু তাই মনটুকু কিছু নাই
মন চুরি কে করিল বল না গো
সারাটি জীবন ছিল শান্তি সুখময়
এ পৃথিবী ছিল শুধু সুখেরই আলয়
প্রকৃতিরও সনে মিশি খেলিতাম দিবানিশি
সে সুখেতে বাদ কে আর সাধিল গো'

গানটা শেষ হতে না হতেই কুঞ্জার ঘর থেকে সিনথেসাইজারে অর্গানের সুর ভেসে আসছে। এযে তার গানের মোক্ষম জবাব। তফাৎ অঙ্কুরের বাংলা গান আর এটা উর্দু—এই যা।

কার গান কে জানে!

ওপাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিশ্চয় কুঞ্জা সব শুনেছে।

কুঞ্জার মহানুভূতির তুলনা নেই। কি করে ব্যথা ভুলে যেতে পারে সেই চেষ্টা। প্রবল প্রয়াস। কত লক্ষ্য রাখে এরা! অতিথি-আলয়ের সব মানুষের কত নজর অঙ্কুরের ওপর, সদা-সর্বদা। কত ভালোবাসা। এ জায়গাটা কেন পায় নি আগে! কেন পায় নি!

অদৃষ্টের লিখন না হয় খণ্ডন।

মধুকণ্ঠী কুঞ্জা গাইছে। সঙ্গত করছে বোধহয় ওর পাশের ঘরের ওরই যমজ বোন কিন্নরী। তবলায় কিন্নরী অনেক পুরস্কার পেয়েছে। ছেলে গাইয়েদের সঙ্গেও বাজায়।

প্রতিভা। প্রতিভা।

কুঞ্জার গলায় উর্দু গজল খোলে ভালো। আজও সুন্দর গাইছে। ওর ঘরেতে যেতে ইচ্ছে করছে।

অঙ্কুর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। করিডোর দিয়ে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে। হাতে তাল দিচ্ছে। মাথা নেড়ে বলে উঠছে, বাহবা বাহবা।

কুঞ্জার উচ্চারণও কত সুন্দর। স্পষ্ট উর্দু। কি সুন্দর কাজ। ছোট ছোট।

জানেওয়ালা কো জানে দো
রুখনা না চাহিয়ে
দিলকা দর্দ না সমঝে জো
কেয়া সমঝাইয়ে
মহব্বত না যিস দিলোঁ মে
কেয়া সমঝ উনকো ইয়ে আঁসু মে
দো দিন কা মেহমান আয়ে
মেহেরবানি না কিয়ে

কুঞ্জার খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে অঙ্কুর।

কুঞ্জা দু চোখ বুজে গানে মগ্ন।

আনেওয়ালা কো আনে দো
আদাব কি জিয়ে
গরীবখানে মুসাফির কো
সওগাত কিজিয়ে
আঁখো মে সুরমা বনা কর
দিলমে তসবির বনা কর
আপনি খুশি সে উনকো
খুশ কিজিয়ে

চোখ ঘুরিয়ে মাথা ঘুরিয়ে তবলায় জোরে চাঁটি মেরেছে কিন্নরী। কুঞ্জা চোখ খুলে তাকিয়েই কার্পেট ছেড়ে উঠে পড়েছে।—আসুন। ছি ছি, এইভাবে দাঁড়িয়ে! কতক্ষণ?

বেশিক্ষণ নয়।

আপনার এত ভালো লেগেছে জানতে পারলে আপনার ঘরেই যেতুম আমরা। বসুন বসুন। এত কষ্ট করে এলেন, বসুন।

অঙ্কুরের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। —কার লেখা এ গান?

মাথা নিচু করে লজ্জায় হাসিমাখা মুখে বলেছে কুঞ্জা, এটা আপনার জন্যে লিখেছি। এই অধম—আমি!

অবাক হয়ে গেছে অঙ্কুর। আপনি!

অঙ্কুর হাসতে হাসতে বলেছে, দেখুন আপনি কথাটা বড় কানে লাগে। মনে হয় দূরের মানুষ। এখনকার আমরা সবাই একই পরিবারের যেন। এখানে তো দেখি সবাই সবাইকে তুমি বলে কথা বলে। আমাকেও তুমি বলেই বলবে।

কিন্নরী অঙ্কুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছে, ঠিক আছে। আপনিও তুমি বলবেন।

নিশ্চয়। নিশ্চয়।

তিনজনে এক সঙ্গেই হেসে উঠেছে। কুঞ্জা আর কিন্নরীর মুখে হাত চাপা। যাতে আওয়াজ বাইরে না বেরোয়।

অঙ্কুরের প্রাণ খোলা হাসি বেশ জোরেই।

হাসির শব্দে উত্তরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বন্ধনী-মা। একটু ভারী দেহ। সাজগোজে আধুনিক। আধুনিক হলেও সেকেলে আভিজাত্যের ছাপ। কথাবার্তায় যুক্তি আর যুক্তি।

বন্ধনী-মা হাসির শব্দে হাজির হয়েছে কুঞ্জার ঘরে। মিষ্টি ক'রে গলা নামিয়ে অঙ্কুরকে বলেছে, হ্যাঁ বাবা, কেমন আছ! কেমন লাগছে?

ভালো মাসিমা। খুব ভালো।

দরকার পড়লে আমাকে ডাকবে। কোনো কিন্তু সংকোচ করবে না।

নিশ্চয়। নিশ্চয়।

কিন্নরী বলে উঠেছে, তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে তো কুঞ্জা! তুমি তো এমন সময় ওঠ না বন্ধনী-মা। এত ভোরে। কুঞ্জার দুষ্টুমির জ্বালায় টেকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমারও ঘুমোবার জো নেই। খাট থেকে টেনে তুলে নিয়ে এল।

কুঞ্জা হেসে কুটি কুটি। বন্ধনী-মা তোকে চেনে।

বন্ধনী-মা কৌচে বসে আছে। বড় বড় চোখ বার করে বলেছে, দ্যাখ কুঞ্জা কিন্নরী বড় বাড় বেড়েছিস তোরা। মুখ ভেংচে বলেছে, বন্ধনী-মা! বন্ধনী-মা! কিসের লা বন্ধনী-মা আমি! আমি সব বন্ধন মুক্ত। কানা-বোবা জ্যোতিষী নাম দিয়েছে। চোখ থাকলে মন থাকলে কেউ এই নাম দিতে পারে! বল বাবা অঙ্কুর। তুমিই বল।

অঙ্কুর না বুঝেই বলেছে, হ্যাঁ মাসিমা। সেতো ঠিক কথা।

এই দ্যাখ। ভালো করে কানের মাথা খেয়ে শোন। অঙ্কুর বুঝেছে। তোরা আর বুঝবি কবে! যার হয় না নয়ে তার কি আর নব্বইয়ে হয়! কি ভালো ছেলে অঙ্কুর। তার কি কষ্ট ভোগই না গেল। সবই তো শুনেছি নিগমবাবুর মুখে। আহা-হা-হা, কিচ্ছু ভেবনা। কিচ্ছু ভেব না। কম বয়েসে কষ্ট ভোগ করাটা ভালো। বেশি বয়েসে সুখি হওয়া ভালো। তোমার ভোগান্তির যেন শেষ হয় বাবা। তোমাদের সকলের মঙ্গল কামনাটাই আমার চাওয়া। আর চাওয়ার আছে কি? সবই ত্যাগ করেছি। স্বামী! আই ডোন্ট কেয়ার। বনিবনা হয় নি তো কি হয়েছে। সম্পর্ক রাখি নি। প্রয়োজন বোধ করি নি। একমাত্র ছেলে আমেরিকায় যায় যখন কতই বা বয়েস, আঠার-

উনিশের মধ্যে। বলেছি, এত দূরে যাচ্ছ, তুমি আমার সবে ধন নীলমণি। মায়ের জন্যে মন কেমন করবে না!

কি বলছ মা তুমি! তুমি আমার মায়ের মতো মা।

পাখি বাসায় ডিম পাড়ে। ছানা হয়। ছানাদের খাওয়ায়। ওড়ানো শেখায়। তারপর সে পাখি যখন উড়ে যায়, সে কি আর ফেরে কোনো দিন! নেভার কাম ব্যাক।

যেখানেই থাকি জেন তুমি আমার মা। আমি তোমার ছেলে। ছেলের আমার মহৎ প্রাণ। মেমসাহেব বিয়ে করেছে। আহা! বাঙালি মেয়ের চেয়েও কি সভ্য কি ভদ্র। কি ভালো ব্যবহার। কিসের মায়া! কার জন্যে মায়া! আমার ওসব কিছু নেই। কারও মৃত্যু আমায় আঘাত হানতে পারে না।

বন্ধনী-মা কাঁদছে। ঘরসুদ্ধু লোকের চোখে জল। এই যে কান্না আমার কাছ থেকে সবাই দূরে সরে আছে—তার জন্যে নয়। এ আমার আনন্দের অশ্রু। ওপরঅলার আশীর্বাদ। কোনো কিছুই আমাকে কাবু করতে পারে না। বাবা অঙ্কুর, আমাকে দেখে শেখ। মনে কোনো কিছু স্থান দিও না। ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ। ত্যাগই আসল সাধনা। ত্যাগেই শান্তি ত্যাগেই মুক্তি। আমি বেশ শান্তিতে আছি। কামনা নেই। বাসনা নেই। আমার বয়েসীরা বলে, বন্ধনী, তুই মহাত্যাগী। তুই যোগিনী। তুই আমাদের পথ দেখা। মুক্তির পথ। ছ্যা ছ্যা ছ্যা। সংসার মানুষে করে। নরক নরক নরক। ঘেন্নায় মরি। ঘেন্নায় মরি।

কৌচ থেকে উঠে পড়েছে বন্ধনী-মা। অঙ্কুরের চিবুক ধরে আদর করে বলেছে, চলি বাবা। সৎময় মহারাজকে একটু প্রণাম করে আসি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে এসেছে অঙ্কুরের কাছে। আজকে আমার ঘরে খাবে তুমি। কি ভালোবাস, কি কি খাও তুমি আমায় একটু বলে দিও বাবা।

কুঞ্জা আর কিন্নরী দুজনেই এক সঙ্গে বলে উঠেছে, আমরা কি বাদ পড়ব না কি?

মাথা নেড়ে হাত বাড়িয়ে বলেছে বন্ধনী-মা, কবে বাদ পড়েছিস লা তোরা! যখুনি যাকে বলেছি, তোরা তো গিয়ে আগে পাত পেড়েছিস। খাওয়াই নি কি? বল কি খাবি তোরা? কি রাঁধব।

দুজনে গলা মিলিয়ে এক সঙ্গে বলে উঠেছে, সে তো ঠিক। সে তো ঠিক। খাওয়ানোর বেলায় তোমার তুলনা তুমি। এরকম ডেকে ডেকে কেউ খাওয়াবে না। এটা পাঁচ বছরের ছেলেও জানে আর বোঝেও।

বন্ধনী-মায়ের মুখে হাসি। আনন্দে গদ গদ। পাশের ঘরে গিয়ে সৎময়জিকে প্রণাম করে জিগ্যেস করেছে, আপনি আজ কি খাবেন?

কিছু নয় মা। কিছু নয়। অনেক খাইয়েছ মা।

তা হয় না। খেতেই হবে। আমি নিজের হাতে রান্না করব।

মাথা ভর্তি ঘাড় ছোঁয়া রুপোলি চুল। গোঁফ-দাড়ি। ফর্সা মানুষ।

আশ্চর্য দু চোখ। যার যে হারিয়ে যায় ওঁর কাছে এলে ওঁর দু চোখের তারায় খুঁজে পাওয়া যায়।

লোক আসে। সান্ত্বনা পায়। শান্তি পায়। পায় মনের জোর। বুক ভরা আনন্দ নিয়ে ফিরে যায়। আবার আসে। আবার আবার আবার।

বছর চারেক বয়েস হবে।

ছোট শিশু সৎময় মায়ের পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে।

দু পায়ে বেলো করছে অর্গানের আর দু হাত রিডের ওপর চালিয়ে যাচ্ছে মা। অর্গানের সুর মায়ের গলায় এক হয়ে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে গান গাইছেন আধো কথায় সৎময়।

কে তুমি
তুমি কি জীবনসাথী
পথের দিশারী
মনে-প্রাণে জানি আমি
আমি তোমারই
তুমি কি বলিতে পার
তুমি আমারই...।

সামনে অপর দিকের দেয়ালে সোনালী কাজের ফ্রেমে আঁটা মানুষপ্রমাণ বিরাট বেলজিয়াম কাঁচের পল তোলা আয়না।

গাইতে গাইতে আয়নার দিকে তাকিয়ে সৎময় বেহুঁশ হয়ে গেছেন। হাতে-পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। পেরেক বেঁধা যন্ত্রণা।

এদিকে মাথার ওপরে ঝোলান ছবিটার দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আয়নায়। ক্রুশবিদ্ধ যিশু। কতক্ষণ এ অবস্থা কে জানে!

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেয়েছেন সৎময় মায়ের মিষ্টি কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরে গানের সুর আর প্রার্থনার কথা।

বল বল প্রভু, এদের ক্ষমা কর। এরা অজ্ঞান। কি করছে নিজেরাই জানে না...।

থেকে থেকে থেমে থেমে কি একটা করে মায়ের মুখের প্রতিটি কথা উচ্চারণ করেছেন সৎময়।

আগের মতো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন আবার। যিশুর সঙ্গে সৎময়ের কেমন নিকট যোগ আছে যেন।

মেরি মাতার কোলে যিশুর ছবি দেখলে, সে কি আনন্দ! আর ক্রুশবিদ্ধ দেখলে?

যন্ত্রণা যন্ত্রণা যন্ত্রণা। সীমাহীন যন্ত্রণা। ছোটবেলা থেকেই সৎময় খুব স্পর্শকাতর। কোনো কিছুই নিজের বলে মনে হয় নি। তাঁর সবকিছুই যেন সকলের। নিজের বলতে কিছুই নেই। ভাবুক আর স্নেহে গড়া মন।

বড় হয়েও তরুণ বয়সেও এ ভাব একটুও সরে যায় নি মন থেকে। বরং আরও বেড়েছে। লোককে বিলিয়ে দিয়েই শান্তি। কত অনটন-অভাব না কত লোকের। আয়ত দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে।

বিয়ে হওয়ার পরেও। স্ত্রী কিন্তু সৎময়ের এই ভাব পছন্দ করে নি।

ছেলেপুলে হওয়ার পরে দারুণ উগ্রচণ্ডা হয়ে উঠেছে স্ত্রী। —একি! ভবিষ্যতে পথে বসিয়ে যাবে সকলকে। 'পথে বসিয়ে যাবে' 'পথে বসিয়ে যাবে'—এক কথা বার বার শুন শুনে ছেলেরাও বাপের ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছে।

শ্রদ্ধার জায়গায় অশ্রদ্ধা এসে গেছে। বাবা চক্ষের বিষ।

মদমত্ত যৌবনে ছেলেরা বাপের ব্যবহার বরদাস্ত করে নি। দস্তুরমতো প্রতিরোধ করেছে। বেশি করে ইন্ধন যোগান দিয়েছে মা।

রাতদুপুরে বাবার ঘরে তিন ছেলে গিয়ে উপস্থিত। বাবাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরেছে দুজনে সজোরে। খাটে মাথায় বালিশের তলা থেকে চাবির তোড়া তুলে নিয়েছে তৃতীয় জন।

আলমারি বাক্স খুলে যথাসর্বস্ব নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আঙুল তুলে উঁচু গ্রামে গলা চড়িয়ে বলে গেছে তিন জনে একই কথা। —মুখ খুলবি তো জন্মের মতো শেষ।

এ সব ঘটে যাওয়ার পরেও কি এ বাড়িতে এদের সঙ্গে আর থাকা উচিত। সৎময় খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে।

চলে গেলে কি কর্তব্য ধর্মে কোনো ক্ষতি হবে?

কেন?

ওদের পথ তো ওরা বেছে নিয়েছে।

আর কোনো দিনই এদের সঙ্গে থাকা সঙ্গত নয়।

সেই রাতেই চুপিসাড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন সৎময়।

বেশির ভাগ স্পর্শকাতর মনের মানুষের বুঝি এই দশাই হয়।

আঘাত আসে ঘুরে ফিরে।

এসেছে।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন নিজে স্ব-ইচ্ছায়।

এবার সৎময়ের জীবন অধ্যায়ের অন্য দৃশ্য অন্য নাটক।

চেয়েছেন মানুষের মন তৈরি করতে। আশ্রম করতে চান নি। মন তৈরি হলেই, সেই মনের মানুষ নিজেই এক একটা আশ্রম। অনেকের আশ্রয়।

পুনেতে তৈরি করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের আশা কি পূরণ হয়েছে সৎময়ের? দুর্দান্ত লোভী ক্রোধী হিংসুকে মানুষদের মনের পরিবর্তন করতে পেরেছেন কি?

না, পারেননি। মস্ত পরাজয়।

কেমন করে করবেন?

আশ্রয় হয়েছে। কিন্তু প্রবল প্রতাপ ক্রোধ হিংসা লোভের। লোভ ক্রোধ হিংসা সে আশ্রয়কে গ্রাস করেছে।

সে আশ্রয়ের দরজায় প্রহরী বসেছে। সৎময়জির প্রবেশ নিষেধ। সঙ্গীদেরও।

শেষে বনবীথি এই অতিথি-আলয়ে এনে তুলেছে সৎময়কে।

আশা এখনও মানুষ হয়ে উঠবে। লোভ ক্রোধ হিংসে শান্ত হয়ে যাবে। তাই বার বার অতিথি-আলয়ে লোকদের প্রত্যেককে বলেছেন সৎময়জি, ভালো কাজ করার অহংকারকেও ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে মানুস হয়ে ওটা অসম্ভব। মানুষের খোলসে পশুকে জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়।

সৎময়জির ঘর থেকে বেরিয়ে দাদা-বৌদির ঘরে প্রবেশ করেছে বন্ধনী-মা। জানিয়েছে নেমন্তন্নের কথা। হেসে বলেছে, বৌদি, তুমি রোজ রোজ বড্ড খরচ কর। আমাদের বড় লজ্জা করে। এরকম করলে আয়ের ঘর শূন্য হয়ে যাবে যে।

লজ্জারাঙা মুখে বন্ধনী-মা বলেছে, আমার কোনো মোহ নেই কিছুতে। ত্যাগ আমার মহামন্ত্র। আমি ত্যাগী। কোনো কিছুই আমাকে নাড়া দেয় না। মৃত্যু আমাকে অচল অটল করে রেখেছে। প্রিয়জন আপনজন চলে গেছে। চোখে জল আসে নি। আমাকে দেখে অনেকে বলে, তুমি ত্যাগের শ্রেষ্ঠ-উদাহরণ।

দাদা বলেছে, যাই বল বোন, একটা ত্যাগ তোমার হয়নি এখনও।

মৃদু গলায় বন্ধনী-মা বলেছে, কেন দাদা! কোনটা!

হাসতে হাসতে বলেছে দাদা, এই বার বার নিজের ত্যাগের মহিমা কীর্তন।

হেসে উঠেছে তিন জনে।

বন্ধনী-মা বলেছে, ঠিকই বলেছেন ভাই। ওটা কিছুতেই পারছি না। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

সৎময়জিকে আগে থেকেই জেনেছে দাদা-বৌদিরা। আলাপ পরিচয় আগে। ওঁর জীবনের ছায়া বুঝি পড়তে শুরু করেছে ওদের ওপর। অবুঝ রাগী অবাধ্য ছেলেদের অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়ে উঠেছে। আর বাড়তে না দিয়ে শেষ

অপমানের অপেক্ষা না করে ছেলেদের নামে বিষয়-আশয় লিখে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।

তোমরা বুড়ো-বুড়ি হয়েছ। মরণ তো নেই তোমাদের! দিব্যি বসে বসে বাপ-ঠাকুর্দার বিষয় ভোগ করছ! আমরা কবে ভোগ করব তা হলে? তোমাদের উচিত সরে পড়া। সে সবের নাম-গন্ধ দেখা যাচ্ছে না।

এরপর কি দাঁড়াবে বুঝতে আর বাকি থাকে নি দাদা-বৌদির। হাসিমুখে মানে মানে বেরিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ, আসে। আত্মীয়-স্বজন ছেলেরা দেখা করতে আসে।

সে দিনে দাদার ছোট ভাই এসেছে।

সে এক কাণ্ড।

দাদা-বৌদির ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। চাঁদনি শুনে দৌড়ে গেছে। কেন কান্না কিছু বুঝতে পারে নি। কিন্নরী কুঞ্জা অঙ্কুরকে ডেকে এনেছে। কেউ মারা টারা গেছে বোধহয়। কান্নার হদিশ মিলেছে।

দুই ভাইয়ে তর্কাতর্কি। দাদা বলছে বৌদিকে—তুমি ঐ গানটা গাও। বড় ভালো গান। হোক না পুরনো দিনের গান। এখন তো পুরনো দিনের গান ফের চালু হয়েছে। 'পাগল পাগল বলে লোকে...।'

দেওর বলেছে বৌদিকে। ওসব ছিঁচকাঁদুনে দুঃখের গান আমার শুনতে ভালো লাগে না। তার চেয়ে বৌদি তুমি গাও—

প্রিয় একলা ঘরে কেমন করে
থাকব বল আর
জীবন হায় তোমারে চায়
উজল জোছনায় চাঁদ ডুবে যায় তার'

দাঁড়াও ভাই। তোমার দাদা আবার রেগে যাবে। ও মায়ের গান শুনতে ভালোবাসে, মায়ের গানই গাই। তারপর তোমায় শোনাব।

পুরনো দিনের বড় নায়িকা ইন্দুবালার গান এটা। রেকর্ড থেকে শেখা আমার।

'পাগল পাগল বলে লোকে
আমি পাগল হতে পারলাম কই
মনটাকে মা মাতিয়ে দে না
যেন তোর নামেতে পাগল হই
খেতে শুতে নাইতে যেতে
মা-মা বলে থাকি মেতে

চিতের ভেতর জ্বালিয়ে চিতে
আত্মহারা হয়ে রই'

কান্নায় ভেঙে পড়ছে দাদা। বৌদিও। কি কান্না। কি কান্না!

দাদা বলছে, আত্মহারা হতে পারলাম কই!

বৌদি বলছে, সত্যিকারের পাগল হতে পারলাম কই।

পকেট থেকে রুমাল বের করে দাদা চোখ মুছছে ঘন ঘন। বৌদি শাড়ির আঁচলে। দেওর চুপচাপ বসে। অবাক চোখে তাকিয়ে। কান্নার কি এত হলো!

হেসে গড়াগড়ি সকলে। এটা গানের কান্না।

হাসির ফোয়ারা ছুটছে।

শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বন্ধনী-মা। —হ্যাঁ রে, তোরা আমায় ডাকলি নে। নিশ্চয় মজার ঘটনা ঘটেছে। নিজের আনন্দটা বখরা করে সকলকে দিতে হয়। সেটাও বুঝলি না এতদিনে। আমাকে দেখেও শিখলি না। অভিজাত ঘরে জন্মেছি। বাড়ি গাড়ি শিক্ষা দীক্ষা রূপ—সবই তো ছিল। এখনও তো আছে। নেই যে তা তো নয়। তোদের আর আক্কেল বিবেচনা হবে কবে! কৃপণ স্বামীর আওতা থেকে বেরিয়ে প্রাণে বেঁচেছি। বাব্বা রে বাবা!

কুঞ্জা বলেছে, তোমার মতো মন আর জ্ঞান আমরা জান এ জন্মে পাব না। সাতটা কাঠামো পাল্টে আসি তারপর।

দৌড়ে এসে বুকে জিড়য়ে ধরেছে বন্ধনী-মা। —কেন হবে না! বলিস নে বলিস নে ও কথা—হাউ হাউ করে কান্না।

দেওরের কথা মতো বৌদি গান ধরেছে।

...কাননে ফিরি যখন
লুকাল কখন
বনে ঝর ঝর ঝর ঝরছে রে বাদল
নাহি কোয়েল দোয়েল
নয়ন ছল ছল আমার

বৌদি বলল, এ গানটা তখনকার দিনের মানিকমালার রেকর্ডের গান।

গান শেষে হাসতে হাসতে বৌদি বলেছে, ঠাকুরপো, আর দেরি কোরো না। যাকে চাও তাকে বিয়ে করে ফেল। বছরের পর বছর সেকি তোমার জন্যে বসে থাকবে! আমরা রাজি।

অঙ্কুর হঠাৎ ওপর দিকে তাকাতেই কাকে যেন দেখতে পেয়েছে। বার বার তাকাচ্ছে। আর দেখতে পায় নি। এক ঝলক বিদ্যুতের আলো বুঝি।



বারো মাসে তেরো পার্বণ। বোশেখের প্রথম দিন। এর মধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। আকাশ বাতাস মাটি তেতে উঠেছে। ঘামে ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজছে। নাইতে আর হচ্ছে না কাউকে। সারা দিনই ঝর ঝর বারিধারা। আকাশ থেকে নয় শরীর থেকে। গরমে প্রাণ আইঢাই! কোথায় পালাই কোথায় জুড়াই।

পালালে তো আর চলবে না। অন্তত এই অতিথি-আলয় থেকে। কারও যাওয়ার উপায় নেই। নতুন বছরে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ঘরে যাচ্ছে। থালা থেকে মিষ্টি তুলে মুখে পুরে দিচ্ছে একে অন্যের। আনন্দ নাচ গান হই-হুল্লোড়।

ছোট বড় কাজের লোক মালিক—কোনো বাছবিচার নেই। সকলের মনপ্রাণ এক সুরে বাঁধা হয়ে গেছে।যে যেমন জানে যে তেমন খাবার তৈরি করছে।

সাঁঝের আলোয় সেকেলে অনুষ্ঠান। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। শাঁখের আওয়াজে মঙ্গল ধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে একতলা দোতলা তিনতলা পর্যন্ত। সকলেই সকলের মঙ্গলে প্রার্থনা করছে। শুভায় ভবতু। গত বছরের ঝুট-ঝামেলা বিপদ আপদ—সব যেন কেটে যায়। নতুন বছরে আর না ঘুরে ফিরে আসে।

নতুন কাপড়-জামা, প্যান্ট-কোটে সেজেগুজে অতিথি-আলয়ের দোতলায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে সকলে। এ ঘর ও ঘর সে ঘর। আবার সে ঘর ও ঘর এ ঘর।

ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি। কারও হাতে গোলাপ। কারও মাথায় চাঁপার কলি।

এবারে এদিকে আবার নতুন বছরের আনন্দ খুশির জোয়ারে আর একটা বিশেষ ধরনের মিলন-আমেজ।

মথুরানি আব রাজস্থানি নাচ আর গান। ওদের দেশের আসল ধাঁচে। দেখার মতো শোনার মতো জানার মতো। অপেক্ষা করছে সকলে। গোল বারান্দায় লোক ভর্তি। ওপর থেকে নিচে দেখা যাচ্ছে।

নিচে সাজানো খোলা মঞ্চ।

মথুরানি মথুরার মেয়ে। রাজস্থানি রাজস্থানের।

দেশের নামে নামকরণ করেছে বনবীথি।

অতিথি-আলয়ের দেখাশোনা খাওয়া দাওয়া ভার ওদের ওপর। দুজনেই মাঝবয়সী। মাঝারি গড়ন। মাজা রঙ। একই সাজপোশাক পরনে। খাগরা-চোলি আর ওড়না। পায়ে মল। দু হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি।

পিঠে বিনুনি ঝোলানো। কপালে রঙিন টিপ। কানে নাকেও গয়না। হাতে রুপোর আংটি।

ঢোল বাজাচ্ছে রাজস্থানির বর বনপত। ভারী পাগড়ি সুদ্ধু মাথা নাড়াচ্ছে ঢোল বাজাতে বাজাতে। পরনে চোস্ত পাজামা আর পাঞ্জাবি। সকলেরই প্রিয়পাত্র। ফাইফরমাশ হাসি মুখে মেটায়। ও অতিথি-আলয়ের মানুষদের বড় আপনজন। সারেঙ্গী বাজাচ্ছে তসবিরউল্লা। অতিথি-আলয়ের হিসেব-নিকেশের ভার তার হাতে।

করতাল বাজাচ্ছে প্রেমবাহাদুর আর দিলবাহাদুর। অতিথি-আলয় আগলায় ওরা দিনে-রাতে। হাসিমুখে।

রাধাকৃষ্ণের বিরহ আর অভিমানের গান। গাইছে মথুরানি।

মথুরানিকে আশ্চর্যলোকের মানুষ মনে হচ্ছে। গানে নাচে সাজগোজে অনেক বয়েস কমে গেছে। একবারে আধাআধি। সত্যিকারের ভেতরটা ভরে উঠেছে। মুখে চোখে বিদ্যুতের চমক।

সৎময়জি গদিআঁটা বড় চেয়ারে বসে আছেন।

দেখে মনে হচ্ছে মথুরানির আনন্দর চেয়ে বেশি সৎময়জির।

ঠিক এই দিকেই একটা বিষাদ নেমে এসেছে অতিথি-আলয়ে কিছুক্ষণের জন্যে। মথুরানির স্বামী বীরবিন্দ, হঠাৎই পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগে। বেহুঁশ। হুঁশ আর আসে নি।

রাতের প্রহর শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

বুকের ওপর আছড়ে পড়েছে মথুরানি।

মথুরানির কান্নায় সারা বাড়ি কেঁদে উঠেছে। চোখে চোখে জল আর জল।

সে সময় বিপদ মোচনের কাণ্ডারী হয়ে বুঝি আবির্ভাব হয়েছে সৎময়জির।

বলেছেন, আত্মার মৃত্যু নেই। দেহ যায়। আত্মা বাতাসে মিশে থাকে। প্রাণে প্রাণে মিশে থাকে। সেই বাতাসে যার দেহ গেছে তার নিশ্বাস বয়ে চলেছে। সে নিশ্বাস সকলের নিশ্বাসে ভেসে চলেছে। সবার মধ্যে বেঁচে আছে বীরবিন্দ। সবার মনেতে সবার স্মৃতিতে বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে চিরদিন। এটা তার আর এক জন্ম। নতুন জন্ম। পিতা মাতা ভাই বোন বন্ধু সন্তান।

সৎময়জির কথার কি সম্মোহনী শক্তি!

চোখের জলে মুছেছে।

বীরবিন্দকে নতুন করে মনে রাখার জন্য আজকের এই গান-বাজনার আসর। বছর পুরল।

সৎময়জি বৃন্দাবনের অন্ধসাধক ভক্ত সুরদাসজির গানের মর্মকথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

রাধিকার কাছে উদ্ধব এসেছে।

কি খবর?

আর বল কেন শ্রীমতী! শ্রীকৃষ্ণের খবর বইতে বইতে আমি ক্লান্ত। কবে মুক্তি হবে জানি না। লোকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করে মুক্তি পেতে চায় ঐ চরণে মিশে গিয়ে। আর আমি? ঐ পাদপদ্ম স্মরণ করে মুক্ত হতে চাই। শ্রীকৃষ্ণ থেকে দূরে যেতে চাই। হেথা যাও। হোথা যাও। এই কর সেই কর। একে খবর দাও। তাকে খবর দাও। চরকির মতো ঘোরাচ্ছে। কি ঘূর্ণীপাকে পড়েছি শ্রীমতী! দুঃখের কথা আর কাকে বলব! যে শুনবে, সেই তো এই কাণ্ডকারখানা করাচ্ছে। যে কথা বলতে এসেছি মুখে আটকালেও বলতে তো হবেই।

উদ্ধব! কি বলতে এসেছ নির্দ্বিধায় বল। আর কি কঠিন কথা শুনব! তোমার মুখ দিয়ে মরণ তো শিয়রে দাঁড়িয়ে শুনে শুনে আমার ভেতরটা ক্ষয়ে গেছে আঘাতে। যত পার তোমরা আমায় শোনাও। শুনিয়ে যাও। তুমি কি বলতে এসেছ আমায়! আমি কলঙ্কিনী! এর ওপর আর কিছু বলার আছে!

না শ্রীমতী। আমি যে কথা বলতে আসি নি। নতুন কথা শোনাতে এসেছি।

বিছানায় উঠে বসেছে শ্রীমতী। —নতুন কথা! কে বলেছে! নতুন কথা বলার লোক আছে কি এ পৃথিবীতে! আমার তো জানা নেই উদ্ধব। বল বল শিগগীরই বল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদ্ধব বলেছে, শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণ যোগী হয়েছেন। বৈরাগী হয়েছেন।

শ্রীমতীর চোখে বিস্ময়। গলায় বিস্ময়। যোগী। সে কি কথা! সেটা কি ধরনের বস্তু?

অস্থির হবেন না শ্রীমতী। তিনি তো যা হওয়ার হয়েছেনই। এবার আপনাকে হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকে পেতে গেলে তাঁর মতো হতে হবে। মাথায় জটা। গায়ে ছাই-ভস্ম মাখতে হবে। গাছের ছাল পরতে হবে। খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ। এক বেলা হবিষ্যি।

উদ্ধব! কাকে এসব করতে হবে বলছ? আমাকে কি? কিছুই বুঝতে পারছি না

আমি। মাথাটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার করে বল। আমি অস্থির হয়ে পড়ছি। এত সয়েছি এখন অল্প সইবার কথা ভাবলেও আমি আর আমাতে থাকি না।

শ্রীমতী, আপনাকে এই সব করতে হবে। সুন্দর কোঁকড়ানো চুলে জটা পাকাতে হবে। ভালো সাজসজ্জা ত্যাগ করে খালি গায়ে ভস্ম মাখতে হবে। গাছের ছাল পরতে হবে। মেঝেয় শুতে হবে। একবেলা দু মুঠো চাল ফুটিয়ে খেলে তবেই পাবেন শ্রীকৃষ্ণকে।

দুকানে হাত চাপা দিয়েছেন শ্রীমতী। মাথা নেড়ে বলেছেন, পারব না। পারব না। পারব না। এত সুন্দর চুলে জটা! এত সুন্দর তনু আমার—সোনা রঙ কালো হয়েছে, কৃষ্ণের বর্ণ হয়েছে কৃষ্ণের কথা ভেবে। সেটা কৃষ্ণই করিয়েছে।

গাছের ছাল পরতে হবে শেষে! কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আমার বাইরের সাজ-সজ্জাটা শুধু দেখেছে এতদিনে। আমায় বুঝতে পারে নি। আমার সাজসজ্জা দেখে তখন বিচার করবে রাধিকা তাকে চায় কি না। নিজের ওপর ধিক্কার আসছে। ছি ছি ছি। এখন কৃষ্ণকে আমি চাইনে চাইনে চাইনে। কৃষ্ণের বিরহে আমি দুর্বল। তার ওপর এমন রূঢ় ভাষা। বিষ সঙ্গে করে এনেছ কি উদ্ধব! ছাইপাঁশ মাখার চেয়ে বিষ খেয়ে মরব, সেও ভি আচ্ছা। কৃষ্ণের নাম করতে করতেকৃষ্ণ নামেই আমি ডুবে মরব।

ব্রজবুলিতে গাইতে শুরু করে দিয়েছে মথুরানি। চোখ আর হাতের ইশারায় সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে শ্রীরাধার অভিমান, বিরহ।

বৈরাগ যোগো কঠিন উধো
হম না করব হো
ক্যায়সে ত্যাজব অঙ্গ চীর
জটা মুকুট ধরব শির
অঙ্গ বিভূতি, লায়ো জহর
খায়ো মরব হো
একতো হম দুর্বল গতা
তায় লিখত কঠিন বাত
কৃষ্ণ বিরহ লাগি বলুক
ডুব মরব হো

গান শেষে জোড়হাত করে হাসিমুখে সকলকে প্রণাম জানিয়েছে মথুরানি। সকলের মধ্যেই তার বীরবিন্দকে দেখেছে। খুব খুশি।

এবার রাজস্থানীর পালা।

ওপর দিকে তাকিয়ে আছে রাজস্থানি। সৎময়জির চোখে চোখ। সৎময়জি বলতে শুরু করে দিয়েছেন, দুজনের দুরকম ভাব এক জনকে নিয়ে। রাধার ভক্তির তুলনা নেই। কৃষ্ণ তুমি ভেতরটা দেখ। বাইরে তোমার দেখার কি প্রয়োজন! আর মীরা বাঈয়ের? বাইরে ভেতরে সমান। গিরিধারী তুমি বৈরাগী? ঠিক আছে আমিও বৈরাগী। তুমি যা পোশাক পরবে যা সাজবে আমি তাই পরব, তাই সাজব। দেখি কার সাধ্যি আমার কাছ থেকে তোমাকে সরায়। তোমার কাছ থেকে আমাকে সরায়।

মীরা বলছে রানা কুম্ভকে —রানা, ভালো করে মন-প্রাণ দিয়ে শুনে রাখ। আমি গিরিধারীর, আর কারও নই। আমি বৈরাগী হব। আমার প্রভু যে বেশে সেজেছে, আমি সেই বেশে সাজব। আমার সারা শরীর গেরুয়া করে রাঙাব। সে গেরুয়া কি?

গুরুর জ্ঞান। গুরুর উপদেশ।

অঙ্গ অঙ্গ আমার গুরুময় হয়ে উঠবে। জ্ঞানময় হয়ে উঠবে। এই আমার গেরুয়া। আমার অলঙ্কার আমার মন। সেই মুদ্রা।

বাইরের মন্দির ভেঙে দিলে কি হবে! ভেতরের মন্দির কেউ ভাঙতে পারে? গেরুয়া। আমার অলঙ্কার আমার মন। সেই মুদ্রা।

বাইরের মন্দির ভেঙে দিলে কি হবে! ভেতরের মন্দির কেউ ভাঙতে পারে? আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে মাটির বুকে, গাছে গাছে, জলে জলে, প্রাণে প্রাণে, যে গিরিধারী, সেই গিরিধারীকে কোনো দিন কি মুছে ফেলতে পারবে কেউ, কোনো দিন?

সৎময়জি মৃদু হেসেছে। উঠে দাঁড়িয়েছে রাজস্থানী। সকলকে জোড় হাতে প্রণাম জানিয়ে রাজস্থানী ভাষায় গান শুরু করেছে।

নাচে-গানে একটা আনন্দের দোলা একতলা দোতলায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে অঙ্কুরের দৃষ্টি তিনতলার বারান্দায় চলে যাচ্ছে। কুঞ্জার লক্ষ্য এড়ায় নি। কে যেন সরে যাচ্ছে। কে যেন আসছে। পলকে চলে যাচ্ছে। পলকে লুকিয়ে পড়ছে। থেকে থেকে বুঝি ঠাণ্ডা জোছনার ঝিলিক যেন।

গানে নাচে নিচেটা মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। রাজস্থানীর সঙ্গে সকলেই গান শুরু করে দিয়েছে। এমন কি মথুরানিও।

রানা ম্যায় বৈরাগীন হুঙ্গি
যিন ভেষা মেরা সাহাব রি ঝে
সোহি ভেষা ম্যায় ধরুঙ্গি
গুরু কে জ্ঞান রঙ্গু তন-কাপড়া
মন-মুদ্রা পহিনুঙ্গি

যা কো নামো নিরঞ্জন কহিয়ে
তা কো নামো ধ্যান ধরুঙ্গি...।

গানের শেষ। দোতলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। ছেলেরা ছেলেদের বুকে জড়িয়ে ধরছে। মেয়েরা মেয়েদের।

দোতলায় সৎময়জিকে নমস্কারের ধুম পড়ে গেছে।

শুভায় ভবতু শুভায় ভবতু শুভায় ভবতু। সকলের মুখে একই কথা—শুভ হোক মঙ্গল হোক।



খুব কম লোকের ভাগ্যেই সুখ বরাবর থেকে যায় এক ভাবে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে সুখ দুঃখ পাশাপাশি চলে। যেন পিঠোপিঠি ভাই। অন্ধকারের পর আলো। আলোর পর অন্ধকার। সৎময়জি বলেন, এ আলো-অন্ধকারের পৃথিবীতে যারা বাস করে, তাদের দুটো ভাগ ভোগ করতেই হবে। আলো অন্ধকার। সুখ দুঃখ। এটা তো ধ্রুব সত্য।

কুঞ্জা নিজেকে ফালা ফালা করে বিচার করেছে। বিচারের দাঁড়িপাল্লায় ওজনে করেছে। কই, সমান সমান ভাগ তো পায় নি। পেলে তো আপসোস থাকত না মোটেই। খালি দুঃখের পশরা মাথায় করে নিয়ে ঘুরেছে জীবন ভর।

চোখের জল বুকে চেপে নকল হাসি মুখে এনে কাউকে বুঝতে দেয় নি নিজের অবস্থা বিপাকের কথা। অবিশ্যি মরমী দরদী মন নিয়ে কেউ এগিয়েও আসে নি তার হৃদয়ের কথা শোনার জন্যে।

এক্ষেত্রে বলার কি থাকতে পারে! শোনার কেউ নেই যেখানে।

আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে কুঞ্জা কিন্নরী যাতে সুখী হয়। সারা জীবনের দুঃখের আওতা থেকে কিন্নরী যাতে দূরে থাকে। এ সবের তাপ স্পর্শ না করে কোনো দিন।

সে দুঃখী।

তার ভোগ সে ভুগছে। ভুগবে। কবে শেষ জানে না।

অন্যকে ভাগীদার করবে কেন?

জীবন গেলেও কুঞ্জা তা পারবে না।

সেদিনের সে কি মর্মান্তিক দৃশ্য।

বাবা ড্রাইভারের পাশে বসে। মা ভেতরে।

মথুরা যাওয়ার রাস্তায় বাঁকের মুখে একটা মরণ বুঝি হাতছানি দিয়ে ডাকে সবাইকে।

ডেকেছে। ড্রাইভারের অজান্তেই গাড়িটা ঘুরে গিয়ে আর একটা গাড়ির মুখোমুখি আছড়ে পড়েছে। চতুর্দিকে 'গেল গেল' রব। আঘাত গুরুতর। বাবা

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। মা যেতে পারে নি। গেলে ভালো হতো হয়ত। ভোগান্তির একশেষ। হাড়গোড় ভেঙে দ একেবারে। যে কদিন বেঁচেছে চেতনা হারিয়েই বেঁচেছে।

অদ্ভুত লেগেছে কুঞ্জার কাছে। সত্যিই কি অদৃষ্ট বলে কিছু আছে! সত্যিই কি নিয়তি বলে কিছু আছে! এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে কী বলে আখ্যা দেবে কুঞ্জা! অশান্ত মন নিয়ে সৎময়জির ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়েছে পায়ের কাছে।

ডান হাতখানা মাথায় রেখে সৎময়জি বলেছেন, শান্ত হও। সহ্যশক্তি ধৈর্যশক্তি বাড়ুক তোমার।

আগুনে জল পড়েছে। মাথাটা হালকা হয়ে গেছে। —হ্যাঁ, তাকে যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। সহ্য করতে হবে।

অন্ধকারে আলো। অকূলে কূল। বিপদে সহায়। এই সৎময়জি।

কুঞ্জা ভেবে খুঁজে কূল-কিনারা পায় নি। ভবিষ্যতে কোনো দিন পাবে কিনা, তাও জানে না! কেমন করে কী করে বছর ঘুরতেই একই তারিখে একই সময় একই রকমের দুর্ঘটনা আবার ঘটেছে।

দু হাত দিয়ে চেপে ধরছে কুঞ্জা। চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়েছে। বুকের ওঠানামা দ্রুত থেকে দ্রুত হয়ে উঠছে। গরম নিশ্বাস।

ঐ একই জায়গায় একই রকমের দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে রূপময়।

বিধাতা কি শক্ত জান গড়েছে কুঞ্জার। মরেও মরে নি। বেঁচেও সত্যিকারের বেঁচে আছে কি আজও!

না, কখনই তা সম্ভব নয়। মাথার বাঁ দিকে আঘাত লেগেছে। ভুগেছে বহুদিন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি সম্পূর্ণ মুছে গেছে বাঁ চোখের তারা থেকে।

রূপময়ের সঙ্গে বিয়ে পাকাপাকি। হলো কই! হওয়ার নয়, তাই হয় নি।

তখুনি বুঝেছে কুঞ্জা বর-ঘর তার নসিবে লেখা নেই হয়ত।

শোকে কাতর মনের ভেতর আর একটা নির্দয় হ্যাংলা মন আছে, সেটা বুঝতে পারেনি। পেরেছে পরে। সে মনের কিছুতেই তৃপ্তি নেই। চাহিদার শেষ নেই। আকাঙ্খা আশায় গড়া পূর্ণমাত্রায়।

ছি ছি! থাকলেও নিজের ওপর নিজের বিরক্তি আছে। ঘেন্না আসে।

এই মানুষ এই প্রকৃতি এটাই ভেতরের কি মানুষের আসল রূপ! একটা হারিয়ে যাওয়া রেশ সরে যেতে না যেতে আর একটাকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস। জঘন্য জঘন্য।

কি ভুল। কি ভুল! ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছে কুঞ্জা।

ভাবতে পারেনি যে রূপময় মধুনীপ নয়।

রূপময়ের প্রাণ ভালোবাসায় ডুবে থেকেছে কুঞ্জা। শান্ত শীতল।

মধুনীপের?

মোটেই না। মরুভূমির শুকনো উত্তাপ। প্রথম প্রথম বুঝতে পারে নি। এ বোধ শেষের দিকে।

মায়া-মরীচিকা দেখেছে গোড়ায়। টলটলে জল। সবুজ গাছ।

জীবনের মর্মান্তিক কথা শুনে কি সহানুভূতি মধুনীপের।

ট্রেনে দিল্লি যাওয়ার পথে নিজ হতে কাছে এসে আলাপ করেছে মধুনীপ।

কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কাগজে ম্যাগাজিনে অনেক ছবিতে। এক্সকিউজ মি। আপনি কি মডেলিং করেন?

হ্যাঁ।

এরপর ডাক্তারের কাছে সঙ্গে গেছে মধুনীপ। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছে। আসা-যাওয়া চলেছে নিত্য সন্ধ্যে এই অতিথি-আলয়ে।

এই ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মধুনীপ। নিত্যসঙ্গী। ও না এলে আলো ঝলমলে সন্ধেয় অমাবস্যায় অন্ধকার নেমে আসে কুঞ্জার মনের আঙিনায়।

এক চোখ গেলেও কেউ কিন্তু বুঝতে পারে না কুঞ্জার দৃষ্টি নেই। মডেলিংয়ে কোনো অসুবিধে হয় না। বরং বেশ সুন্দরীই দেখায়। ছবির টানা টানা দু চোখ মানুষজনকে কাছে ডাকে যেন। দৃষ্টিহীনের আকর্ষণ এত! দৃষ্টি থাকলে পরে মাথা ঘুরে মরত কত শত। বন্ধু-বান্ধবরা কুঞ্জার মনকে ঘোরাবার চেষ্টা করে। হাসাবার খ্যাপাবার চেষ্টা করে। মডেলিং করার সময়ও অনেকবার সঙ্গে গেছে মধুনীপ। হাসিখুশি মানুষ। লম্বা। সুদর্শন। চাপা রঙ। চেহারায় আকর্ষণ আছে।

মধুনীপ আর কুঞ্জাকে দেখে অনেক মডেল-গার্ল ঠাট্টা-তামাশা করে, কে জানে ওদের মনের কথা নানা ছলে বলে প্রকাশ করে। —তোর নাগরের কদর বেশি/ আমরা পেলে হব খুশি।

কুঞ্জা মুচকি হেসে চোখ ঘুরিয়ে হেলে দুলে চলে যায়। সেও ছাড়বার পাত্রী নয়। যাওয়ার আগে উত্তর দিয়ে যায়—আমি ছাড়া নাগর নাই/তোদের পোড়ার মুখে পড়বে ছাই।

মধুনীপ দৌড়ে এসে কাঁধে হাত রেখেছে কুঞ্জার। একসঙ্গে চলেছে দুজনে। তালে তালে। পায়ে পা মিলিয়ে।

ঠাট্টা করে বললেও মনের সত্যি কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কুঞ্জার। নিজের অজান্তে।

মধুনীপ কথা দিয়েছে কোনো দিন ছাড়বে না তাকে। মৃত্যু অবধি। কুঞ্জার মরণে যেন মধুনীপেরও মরণ হয়। চোখ গেলে ভয় কি! মধুনীপের দু চোখ তো আছে! সেই চোখে চলবে ফিরবে দেখবে কুঞ্জা।

আশ্বাস বিশ্বাস করেছে কুঞ্জা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ পাঠিয়ে দিয়েছে উপযুক্ত সঙ্গীকে। কুঞ্জা কিন্নরী নাচ-গানের আসরে গেলে সেখানেও মধুনীপ সঙ্গী। কিন্নরী তবলাতেই ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। নাচ-গানে মোটামুটি।

কুঞ্জা নাচে গানে রঙে ঢঙে বিশেষ। নিজে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। দর্শক শ্রোতাদের মাতোয়ারা করে তোলে। একবার যে ওর নাচ দেখেছে গান শুনেছে, আবার দেখার জন্যে শোনার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে।

ওর বলা ওর গান ওর চাউনি ছন্দে ছন্দে পায়ের পাতার নাচন মানুষকে দুনিয়া ভুলিয়ে দেয়। অপরিসীম আনন্দ। এ আনন্দের কোনো অংশই কেউ ছেড়ে দিতে পারে না কাউকে। বাবা পারে না ছেলেকে। ছেলে পারে না বাবাকে। মা পারে না বাবাকে। মা পারে না মেয়েকে। মেয়ে পারে না মাকে।

চাঁদনিকে সাজিয়ে দিয়েছে দাদা-বৌদি।

কুঞ্জাকে তাক লাগিয়ে দেবে বলে, তাক লাগাতে গিয়ে তামাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে শেষে। গান শেখান হয়েছে।

তোমায় খবর দিতে পারিনি কো
মনে কিন্তু কোরো না গো

যতবার গানের কলিটা বৌদি মুখস্ত করাচ্ছে চাঁদনিকে, ততবারই ব্যর্থ।

চাঁদনির মুখ দিয়ে একই কথা বেরচ্ছে ঘুরেফিরে—

তোমায় কবর দিতে পারি নি কো
মনে কিছু কোরো না গো

চোখের কোলে কাজল দিয়ে ছোট ছোট জাপানি চোখ বড় করতে চেয়েছে বৌদি। শেষে নিজেই হার মেনে বলেছে, দূর ছাই! এ কখনও হয়! মেজে ঘষে রূপ আর ধরে বেঁধে পিরিত! হয় না হয় না। চাঁদনির মাথায় যে কি ভূত চেপেছে! কুঞ্জার মতো সাজিয়ে দিতে হবে, গান গাওয়াতে হবে।

বৌদির ঘাড়ে চাঁদনি-ভূত। করবেটা কি এখন!

কি বিপদে যে পড়েছে বৌদি একমাত্র বৌদিই জানে। ফ্যাসাদ আর কাকে বলে!

চল, কুঞ্জাদি তোকে সাজিয়ে দেবে।

কুঞ্জা দেখেই হেসে কুটি কুটি! একি কাণ্ড করেছ বৌদি! এত কাজল গাল অব্দি!

আর বলিস কেন বোন! খোদার ওপর খোদকারি করতে গিয়ে এই দশা, এই হাল আমার। বড় চোখ বানাতে গেছি।

আয়নার সামনে মুখ এনে হি হি করে হেসে উঠেছে চাঁদনি। —কি সুন্দর হয়েছে কুঞ্জাদি!

সুন্দর হয়েছে না বানর সেজেছিস!

জিদ ধরেছে চাঁদনি। সকলে তাকে দেখবে। সে নাচবে গাইবে।

ভালো। নিজের বোকামি বেহায়াপনা তুলে ধরা সবার সামনে: আয়—

হাত ধরে টেনে নিয়ে নিচে নেমে গেছে কুঞ্জা।

তসবিরউল্লাকে বসান হয়েছে সারেঙ্গী বাজাতে। তবলাতে কিন্নরী।

এতদিন নাচ দেখেও চাঁদনি যা অঙ্গভঙ্গি করে নাচছে, সবই বাইরের-নাচের কায়দা কানুন। কুঞ্জার ধারে কাছেই নেই।

গানের কলিরও সেই দুর্দশা।
তোমায় কবর দিতে পারি নি কো
মনে কিছু কোরো না গো।

হাসির হুল্লোড়। গোটা বাড়িতে দম ফাটা হাসি। হলুদ ফরসা মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। মাথার ওড়না খুলে বৌদির কোলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ছুটে ঘরে চলে গেছে।

চাঁদনি চলে যেতে আরও জোরে হাসির ঢেউ দুলে দুলে উঠেছে বাড়িময়।

চাঁদনি বিছনায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

কুঞ্জা গিয়ে চিবুক ধরে আদর করে বলেছে, তোর নাচ গান এত ভালো হয়েছে, তুই এত আনন্দ দিয়েছিস, এরকম কেউ দেয়নি। আমার নাচ গানে কেউ এত আনন্দ পেয়েছে!

হাসতে হাসতে উঠে বসেছে চাঁদনি। আয়নায় নিজের মুখ দেখছে। হুঁ-উঁ-উঁ—কি বিচ্ছিরি! ভূতের মতো দেখাচ্ছে। কি সাজিয়ে দিয়েছে বৌদি!

বাঁ কানে হাত চাপা দিয়ে ডান হাতে চাঁদনির চিবুক ধরে নেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে গেয়েছে কুঞ্জা—

আয়ো বালোমোয়া রে
কই না সমঝে মুঝে
কই না শুনে মেরি
দিলকি বাতিয়াঁ রে

কই না জানে মোরা
দিল কে দরদিয়া রে

ঘরে এসে ঢুকেছে বন্ধনী-মা।

পায়েস আর পাটিসাপটা নিয়ে।

হাতের ট্রেটা থর থর করে কাঁপছে। ধর ধর, কি দেখছিস হাঁ করে চেয়ে মুখের দিকে! এখন কি আমার চন্দ্রবদন দেখবার সময় হলো তোদের! এখনই পিঠে-পায়েস পড়ে ছড়াছড়ি যাবে। খালি মুখে 'মা মা' বলা—মেয়েদের কোনো কর্তব্যজ্ঞানই নেই।

বলি এই কুঞ্জা, ধরবি তো। লোককে আদর করলেই চলবে। নে খা সব। গরম গরম করে এনেছি। ক্ষীরের পুরের পাটিসাপটা। আর ঘন দুধের সিমাই-পায়েস।

পায়েসের বাড়িতে পাটিসাপটা ডুবিয়ে চাঁদনির মুখে তুলে দিয়েছে বন্ধনী-মা।

জুতো মসমস করে দৌড়ে এসেছে মধুনীপ। হাতের কাছে মুখখানা নিয়ে গিয়ে হাঁ করে বলেছে, আমার মুখে। আমার মুখে।

ছদ্মকোপে চোখ পাকিয়ে তেড়ে গেছে বন্ধনী-মা। মেয়েদের মহলে কোথা থেকে ছেলেরা ঢোকে বল তো! সাহস তো কম নয়। শৃঙ্খলা ভঙ্গ। যে কোনো উপায়ে শৃঙ্খলা আনতেই হবে। একি কথা!

অঙ্কুর বুঝি শৃঙ্খলা ভঙ্গ নয়? ও মেয়ে নাকি!

মুখ ভেংচে বলেছে বন্ধনী-মা, না ও মেয়ে নয়। ও আমাদের ছেলে। বুঝলি! তুই পুরুষ মানুষ।

অভিমানের সুরে মধুনীপ বলেছে, বাব্বা, একটা পিঠে খেতে চেয়ে এত কথা! থাক খাব না। চললুম।

বন্ধনী-মা-র ব্যাকুল কণ্ঠ, ওরে যাসনে যাসনে যাসনে। শিগগীর এসে খেয়ে যা বলছি। নইলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেব। কেউ আমরা খাব না।

গুটি গুটি পায়ে হাসতে হাসতে এসে দাঁড়িয়েছে মধুনীপ।

চাঁদনির দৃষ্টি যেন অনেক দূরে চলে গেছে। কোথায় কে জানে!

পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কুঞ্জা বলেছে, কি হলো রে! কি ভাবছিস এত?

মায়ের কথা। কথাটা কানে যেতেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বন্ধনী।

হ্যাঁ রে চাঁদনি, মা-বাবাকে নিয়ে কে কবে এক সঙ্গে থেকেছে বল তো! বিশেষত এই যুগে!

নিজের বুকে হাত দিয়ে বলেছে, আমার ছেলে, বুঝলি আমার ছেলে—সাধু-সন্ত-

জ্যোতিষীরা বলেছে, মহাপুরুষ! আহা-হা-হা। আমেরিকান লেডিকে বিয়ে করেছে। কি সুখী!

শোন বলি, ছেলে যখন আমেরিকায় যায়, তখন ওর বয়েস আর কত! বছর উনিশ হবে। বলেছি, তুমি আমার একমাত্র ছেলে। মা ছাড়া হয়ে যাচ্ছ। থাকতে পারবে!

মা, তুমি কি বলছ! তোমার মুখে একথা শুনব আশা করি নি। তুমি আমার মায়ের মতো মা। পাখিরা ডিম পাড়ে। ছানা হয়। ছানাকে খাওয়ায় দাওয়ায় উড়তে শেখায়। ছানা আকাশে উড়ে যায়। নেভার নেভার কাম ব্যাক। আর কি ফিরে আসে? তবে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন তুমি মা আমি ছেলে—এ শব্দ মুছে যাওয়ার নয়।

কুঞ্জা মুখ টিপে হেসে বলেছে, কত বার আর শুনব! বার বার তো এক কথাই শুনছি।

হাতে ঘুষি পাকিয়ে হাত ছুঁড়ে বলেছে বন্ধনী-মা, আমি গর্বিত। আমি সম্মানিত। আই ডোন্ট কেয়ার এনি আদার।

পাশ দাঁড়িয়ে রয়েছে বৌদি—সে খেয়াল নেই বন্ধনী-মা-র। তার নাকে ঘুষি।

নাকে হাত চাপা দিয়ে বৌদি বসে পড়েছে। —উ-হু-হু-হু।

বন্ধনী-মা বলে উঠেছে, আহা-হা-হা। শীগগির ফ্রিজ খুলে নিয়ে আয় বরফ, নিয়ে আয় জল।

চাঁদনির ঘর থেকে সবাই দৌড়ে বেরিয়ে গেছে। বরফ, জলের বালতি মগ এসে হাজির। নাকে ঢালতে গিয়ে মাথায় জল। বৌদি চান করে গেছে। আর গদি ভিজেছে বরফের জলে। চাঁদনির বিছানায় বরফ। হই হই রই রই কাণ্ড। ডাক্তারকে ফোন করা হয়েছে।

বন্ধনী-মা বলেছে, একি কাণ্ডকারখানা তোদের সবার! সব জিনিসে শৃঙ্খলা চাই। শৃঙ্খলা রাখতে হবে।

চাঁদনির মাথায় হাত চোখে জল। তার বিছানা ভিজে ঢাউস। কার্পেট ভিজে জবজবে। চাঁদনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, সব ভিজে গেল। জল জল। কি যে করি আমি!

বন্ধনী-মা ধমকেছে, ছিঁচকাঁদুনেপনা করবি নে একদম। আমার বিছানা দিয়ে যাচ্ছি এখনই। শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যে সব ত্যাগ করছি। হাজবেন্ডকেও। আই ডোন্ট কেয়ার। আমার মতো ত্যাগী আছে কে? কারও মরণেও আমার ভেতর নাড়া দেয় নি। চোখে জল আসেনি।

আর তোদের! একটুতেই তোদের প্যানপ্যানানি। আমি মুক্ত। সব দিক দিয়েই

মুক্ত। কোনো বন্ধন নেই আমার।

এই বন্ধনী-মাকে কেউ কাবু করতে পারবে না। পারে নি কোনো দিন। হাজবেন্ডও পারেনি। আরে রহে দো ভাই। থোড়াই কেয়ার করি কাউকে।

দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে ডেকেছে বন্ধনী-মা। আজিজ আজিজ আজিজ।

আজিজ দৌড়ে এসেছে। সেলাম করে বলেছে, ফরমাইয়ে মেমসাব, কেয়া হুকুম। মেরা চারপাইকা উপপর সে গদ্‌দা লে আও। আউর ইয়ে ঘর মে বিছা দো।

জি মেমসাব।

আজিজ যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেছে বন্ধনী-মা-র ঘরের দিকে।

এই অতিথি-আলয় কত রঙ্গে ভরা। দুঃখেও আনন্দ মুখেও আনন্দ। একের ব্যথা অন্যে বুকে তুলে নেয়।

এখানে 'পরের' নাম-গন্ধ নেই। আপনার চেয়েও আপন। কাজি নজরুলের গানের একটা কলি মাঝে মাঝে আনমনা গুনগুনিয়ে ওঠে কুঞ্জার ভেতর থেকে।

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি আমি তারে আপনায়

এখানে সবাই সবার আপন। আজকাল এসব হারিয়ে গেছে। সকলে সকলের ব্যথাতে কষ্ট পেয়ে ভুলিয়ে রাখার জন্যে ব্যতিব্যস্ত। কি মরমী কি দরদী মন নিয়ে এক সঙ্গে বাস করছে এরা! ছোট বড় ভিন্ন বয়েসের ভিন্ন মনের মানুষ। কি জাদু রয়েছে বনবীথির কথায় ভালোবাসায় আর যত্নে। এমন কি আছে যে কেউ এখান ছেড়ে যেতে চায় না। এখান থেকে দু চার দিন বাইরে গিয়েও থাকতে পারে না। কিসের টান কে জানে! ঘুরেফিরে এখানে এসেই হাজির হতে হয়।

কুঞ্জার জন্ম এখানে। কুঞ্জার মা বাবাও এখানকার স্থায়ী অতিথি।

নাচে গানে মডেলিংয়ে কুঞ্জা বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

চোখে দেখার অসুবিধে একটু ঘটেছে।

ডাক্তার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে এ রোগের শেষ পরিণতি কি জান?

বলুন। খুলে বলুন। আমি ভয় পাব না। আমি তৈরি হব নিজেকে ঠিক রাখার জন্য। ডাক্তার গলায় সহানুভূতি। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছে, আমি খুব চেষ্টা করব। যাতে তুমি অন্তত একটুও দেখতে পাও।

ডাক্তার কি বলতে চেয়েছে না বললেও বুঝতে বাকি থাকেনি কুঞ্জার। অন্ধ।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকেছে গালে হাত দিয়ে। ডাক্তার এসে পিঠে হাত

চাপড়ে বলেছে, ডোন্ট ওরি মাই গার্ল। ডোন্ট ওরি।

হেসে উঠে দাঁড়িয়েছে কুঞ্জা। না না ডাক্তারবাবু। আমি কোনো চিন্তা করব না। আপনি ভাববেন না।

মাকে বাবাকে বোনকে—কাউকে জানায় নি। চেপে রেখে রেখে অনেক দিন হয়ে গেছে। বাঁ চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে কুঞ্জা। জানায় নি কাউকে। অতিথি-আলয়ের লোকেরা দুঃখ পাবে খুব। কুঞ্জা আর একটা যে যাবে, তার জন্যেও তৈরি।

কুঞ্জার চোখের বাহারের জন্যে খ্যাতি চতুর্দিকে। অনেকেই বলেছে, ও চোখের দিকে তাকালে চোখ ফেরাতে পারা যায় না।

কুঞ্জা আশ্চর্য হয়ে ভাবে যে চোখে প্রাণ নেই সে চোখ কী করে কথা কয়। যে চোখ শেষ অবস্থায় চলে আসছে, সে-ই কেমন করে মানুষকে ধরে রাখে। আর চিন্তা করতে পারে না কুঞ্জা। মাথার ভেতর গুলিয়ে যায়। সব ওলোটপালোট।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বড় বড় করে তাকায়। মনকে প্রস্তুত করে তোলে। অন্ধ হয়ে জন্মালে এ দুঃখ আসত না তার। কিন্তু পৃথিবীর সব কিছু দেখে যদি দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে কেউ, সে হারাবার যন্ত্রণা কতখানি, কেউ কি বুঝতে চায়! কেউ কি শুনতে চায়? কার অত সময় আছে? মনের এসব কথা চেপে রাখা যায় না। মনকে শক্ত করে তোলার জন্যে সৎময়জিকে গোপনে বলেছে।

সৎময়জির আশ্বাসবাণী—ওসব ভাবলে তুমি আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। তুমি ভুলে যাও। আনন্দে মেতে থাক। তোমার দৃষ্টি নিশ্চয় থাকবে।

শুনতে ভালো লেগেছে কুঞ্জার। আনন্দেই মেতে থাকতে চেয়েছে সুখে দুঃখে—সর্বক্ষেত্রে।

নিশ্চয় থাকবে। সৎময়জির সান্ত্বনা নয় এটা। কোনো কিছুকে চিন্তায় টেনে আনা উচিত নয়। তাহলে সেটাই ফলে যায়। একথা অনেকেরই জানা।

কুঞ্জা ভাবে না। ভাবতে চায় না। সত্যি কথা বলতে কি ভাবনা আপনা হতেই এসে পড়ে, যখন কোনো দৃষ্টিহীন মানুষকে লক্ষ্য করে। সব রকম অভ্যেসই করেছে চোখ বুজে বুজে, যাতে অন্যের বোঝা না হয়ে পড়ে ভবিষ্যতে।

বাবা গেছে। রূপময় গেছে। মা গেছে। সে একা।

কিন্নরী?

ওর তো স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয়।

হ্যাঁ। মধুনীপ জানে।

মধুনীপকে দেখে মনে হয়েছে এ বুঝি আপনার জন। সেটা প্রথম প্রথম। পরে

মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি আর ভয়। শেষ অব্দি থাকবে তো? মধুনীপ বড় চঞ্চল। ভেতরটা রূপময়ের মতো অত খানি গভীর নয় বুঝি। একটু চঞ্চল।

যার বরাতে সুখ মেলে নি প্রথমটায়, সুখী হতে পারে নি, নতুন করে কি আর সুখ ফিরে আসবে?

মন মেনে নেয় না।

তবু অবলম্বন না চাইলেও একটা অবলম্বন থাকলে ভালো হয়। এটা মানতে বাধ্য কুঞ্জা। সেই সূত্রে মধুনীপকে প্রয়োজন।

মধুনীপের কুঞ্জাকে প্রয়োজন কিনা মধুনীপই জানে।

প্রয়োজন!

সত্যিকারের মনের কথা এটা কি! মুখে যা বলে। মনের কথা নাও হতে পারে। বুকের ব্যথা নাও হতে পারে।

যাক, এসব ভাবনা বৃথা।

ভেবে নিতে হবে মধুনীপ তার হৃদয়ের বাথা বোঝে। এগিয়ে এসেছে চোখের অবস্থার কথা শুনে। বাইরের চমক দেখে নয়।

দিল্লিতে যখুনি ডাক্তার দেখাতে গেছে কুঞ্জা মধুনীপ যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে গেছে। অভয় দিয়েছে। ডাক্তারকে বলেছে, যে কোনো উপায়ে হোক কুঞ্জার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন। আমার একটা চোখ নিয়েও যদি দৃষ্টি ফিরে পায়, আমি রাজি।

এ রোগ সে রোগ নয়। তোমার চোখ দেয়ার কথা ওঠে না। স্পষ্ট উত্তর ডাক্তারের। শশব্যস্ত হয়ে বলেছে কুঞ্জা, না না না। আমার দুর্গতি আমি ভোগ করতে চাই। সে ভাগ কাউকে দিতে চাই না। চোখ দেয়ার অবস্থা থাকলেও আমি কারও চোখ নিতুম না।

তিন মাস ছাড়া ছাড়া আসা-যাওয়া চলছে দিল্লি আর কলকাতা। কলকাতা আর দিল্লি।

গান নাচ মডেলিংয়ের ক্লায়েন্ট আর পেমেন্টের ব্যাপারটা ধীরে ধীরে মধুনীপের হাতে তুলে দিয়েছে কুঞ্জা।

মধুনীপ পরিচয় হওয়ার পর থেকে কুঞ্জাকে হিসেব-নিকেশের মধ্যে রাখতে চায় নি। বলেছে, তোমার কষ্ট হবে। চোখের প্রেশার বাড়বে। আমি তো রয়েইছি। আমিই তোমার চোখ। ভাবনা নেই, আমি সব দেখাশোনা করব। তাছাড়া তুমি তো টাকাকড়ি গুনতেও পার না। কিন্নরীও তথৈবচ। তোমার সব কিছুই এ ধার ও ধার পড়ে থাকে। কাজকর্ম করার লোকেরা তো হরদম আসা-যাওয়া করে ঘরে। আমায় বিশ্বাস করতে পার।

কান্নাকে সংযত করেছে কুঞ্জা। জল গাল বেয়ে পড়তে গিয়েও ঝরে পড়েনি। শুধু দু চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। আর গলাটা ধরে গেছে। বলেছে, হ্যাঁ, তোমরাই আমার চোখ। বিশ্বাস করার কথা আর মুখে এনো না মধুনীপ। বিশ্বাস যদি কাউকে করতে হয় আমি তোমাকেই করি। ভয় হয় কি জানো!

কিসের ভয়? আমি কি তোমায় ছেড়ে চলে যেতে পারি?

না না না। ও কথা ভাববার আগে আমার যেন মরণ হয়। মুখে এনো না আর। ভয়, আমার ভাঙা ভাগ্যের ভয়। নিয়তির গাত্রদাহের ভয়। আমি মানুষ। আমি মর্ত-লোকের। আমি স্বর্গলোকের নই, গন্ধর্বলোকের নই, কিন্নরলোকের নই। তবু কেন আমার ওপর হিংসে নিয়তির? আমার সুখ হয় না বুঝি ওর।

না না কুঞ্জা। আমার পরমায়ু অনেক দিন অনেক দিন। কিন্তু তোমাকে হারিয়ে আমি বাঁচতে চাই না। তুমি যতদিন আমি ততদিন। তোমারই জন্যে যেন বেঁচে থাকি।

জোড়হাতে কপালে ঠেকিয়েছে বুকে ঠেকিয়েছে মধুনীপ। প্রার্থনা।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা।

কুঞ্জার ডান হাতটা বাঁ হাতে চেপে ধরেছে। —যুগ যুগ যেন আমি তোমাকে পাই। সত্যি সত্যি যদি জন্মান্তর থাকে, আবার আসতে হয়, আমি যেন তোমার হয়েই আসি।

আর তুমি? —আমার হয়ে এসো।

মনে হয়েছে কুঞ্জার মনের আকাশে জোছনা ফুটে উঠেছে। তারা তারা। চাঁদ আর তারা।

মধুনীপ—কুঞ্জা ডেকেছে। কণ্ঠস্বরে মিষ্টি সুরের জোয়ার।

আমি তোমায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কুঞ্জা দু গালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে মধুনীপের।

মনে হয়েছে মনের আকাশে জোছ্নার জোয়ার।

...দিল্লিতে ডাক্তার দেখাতে এসে আর এক বিপত্তি। ডাক্তার যা বলেছেন, সেটা কুঞ্জা জানতে পেরেছে হয়ত। কেমন করে জেনেছে বলতে পারবে না।

রোজ রাতের ঘুম ভাঙতেই মনে হয়েছে সে অন্ধ হয়ে গেছে। সত্যিই না মনের ধারণা? বিছানায় বসে বসে খানিকক্ষণই ভেবেছে। যা দেখছে এসব কি সত্যি? না আগেকার দেখা জিনিসের ধারণা?

বুঝছে না না। সব সত্যি। এখনও দৃষ্টি আছে।

দৃষ্টি থাকলে হবে কি? রোজই এই চিন্তার উদয় সূর্য উদয়ের মতো।

ডাক্তার বলবার আগে থেকেই তার ভেতরের ডাক্তার বুঝি বলে দিয়েছে।

ডাক্তার বলেছে, আমি যা স্পষ্ট সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছি তুমি অন্ধ হয়ে যাবে। এবারে আর না বলে পারছি না।

আগে তো এরকম কথা কেউ বলেনি। আমেরিকার ডাক্তাররাও না।

এটুকু জেন সকাল সন্ধে এক নয়। তারা তখন এর বিপদ দেখে নি। দেখতে পায় নি। এ বিপদের চিহ্ন তখন আসে নি। ফ্লুইডের প্যাসেজ বন্ধ হয়ে আসছে। রোখা যাবে না। এখনই ওপন করা দরকার। দেরি একদম নয়।

চেম্বারের বাইরের ঘরে বসে আছে মধুনীপ। ডাক্তার ডেকে জানিয়েছে। ওপন্ করার মত লিখিয়ে নিয়েছে। যদি কিছু হয় আই সার্জন দায়ী নয়।

বন্ড সই করার পরে মধুনীপের মুখ-চোখের ভাব বদলে গেছে একদম। চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেছে বাইরে।

সেই বেরিয়ে যাওয়াই বেরিয়ে যাওয়া।

আজও মনে করলে কুঞ্জার মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। কুঞ্জা ভুলে যেতে চায়। নিজের জীবনের পুরনো পাতা আর ওল্টাতে চায় না।

অপারেশনের পরে কি অপ্রস্তুত কুঞ্জা। ডাক্তারের কি বিপদ। লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না কুঞ্জা।

মমতা ভরা দু চোখে তাকিয়ে বলেছে ডাক্তার। —ভয় কি মাই গার্ল! তুমি আজ এখানেই রাত্তিরে থাক আমার মেয়ের সঙ্গে।

পরের দিন সকালে এসেছে ফিরে। দৃষ্টির পরিবর্তন হয় নি। তবে এখনই অন্ধ হয়ে যাওয়ার বিপদকে আটকে রাখা হয়েছে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। মধুনীপের খোঁজ-খবর কিছুই পাওয়া যায় নি।

মধুনীপ সর্বস্ব নেয়ার জন্যেই এসেছে। তার কার্যসিদ্ধি করে চলে গেছে।

কুঞ্জারা আজ নিঃস্ব। কপর্দপশূন্য প্রায়।

তিনতলা থেকে বনবীথি নিচে নামে রোজ একবার করে। ওদের সান্ত্বনা দেয়। বুঝিয়ে বলে, ছোটবেলায় বনবীথি ছবির দোকানে ছবি দেখেছে তার মায়ের সঙ্গে। ওখানে ভালো ভালো লেখার ছবিও দেখা গেছে। যেমন—'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।' 'অ্যায়সা দিন নহি রহেগা।' 'নিরাশ আঁধারে তুমি আলোর জ্যোতি।'

বনবীথি বলেছে, এত ভেঙনা তোমরা। মানুষের বোধটা বেশি। জন্তু-জানোয়ারের কম। এইখানে মানুষের যত কষ্ট। এত ভাববার কি আছে! আকাশ ভেঙে মাথায় পড়ায় কি আছে! কিছু ভেব না। আমার একটা মেয়ে আছে আর তোমরা দুটো। এই তিনটে মেয়েই আমার।

কুঞ্জা ফোঁপাচ্ছে। হাতরে বালাটা খুলে বলেছে, তবু—

তবু কি! যেমন চলছে তেমনি চলবে।

কুঞ্জা!

বালাটা বনবীথির হাতে দিতে গিয়ে কুঞ্জার কেঁপে উঠেছে।

বনবীথি কুঞ্জার হাত থেকে বালা ছিনিয়ে নিয়ে ওরই হাতে জোর করে পরিয়ে দিয়েছে আবার।

এসে পড়েছে ঘরে বন্ধনী-মা।

কি ব্যাপার ঘটেছে, কেন ঘটছে বন্ধনী-মা বুঝতে পারে সহজেই। এখানেও ব্যতিক্রম ঘটে নি।

রাগের ভান করে বলেছে, ভেবেছিসটা কি! আমাকে এত বড় অপমান! কেন তোরা কি আমার মেয়ে নয়? আমি কি তোদের দুজনকে ফেলে দিতে পারি? খবর্দার—আঙুল নেড়ে বলেছে বন্ধনী-মা। এই কুঞ্জা—দেখি তোর গায়ে কি কি আছে! বলে, নিজের ঘরে দৌড়ে গেছে বন্ধনী-মা। নোটবুক আর পেন দিয়ে এসে হাজির।

কুঞ্জার গলায় একটা সোনার চেন। কানে দুটো টব। হাতে একটা নীলার আংটি।

কিন্নরীর!

হুঁ। কুঞ্জার মতোই চেন একটা গলায়। কানে দুটো দুল—সবুজ ফ্যানসি স্টোনের। আর আমেরিকান ডায়মন্ডের আংটি, দু হাতে সোনার বালা।

নোটবইয়ে লেখা শেষ করে বন্ধনী-মা বলেছে শাসনের সুরে, সব রইল লেখা। আমি রোজ চেক করব। যদি একটা না পাই, তা-লে কুরুক্ষেত্র করব—বলে দিলুম।

দুই বোনের গাল চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

বন্ধনী-মা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বলেছে, চ—সৎময়জির ঘরে চ। শান্তি পাবি।

বনবীথির বিধবার বেশ। বয়েস বছর চুয়াল্লিশ। মনে হয় চব্বিশ। দেহের বাঁধুনি এমন। চোখে মুখে শান্ত সৌম্য সুন্দর আভা। এ জগতের মানুষ হয়েও বুঝি এ জগৎ থেকে অনেক তফাৎ—অনেক অনেক।

সৎময়জির ঘরে নীল পর্দা।

এরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ।

ভেতরে গানের আওয়াজ।

নানা রঙের গালচে বেছান চৌকিতে বসে তানপুরায় সুর ছাড়ছেন। আর আস্তে আস্তে গাইছেন—

'আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি।
তুমি যেন ঘৃণা কোরো না।
করিতে যেমন আদর যতন
সে যতন যেন ভুলো না
আপনার পরে সবারে চিনেছি
হৃদয়ের বীণা ভাঙিয়া ফেলেছি
শুধু কাছে থেকো দুটি কথা কোয়ো
ওগো দূরে সরে যেন যেও না'

সুমধুর গলায় ব্যথা উজাড় করা গান। তন্ময় হয়ে গেছে বাইরে। একি প্রার্থনা সঙ্গীত! একি নিজেকে হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গীত? এ কি সব ব্যথা ভোলার সঙ্গীত?

কাকে, কাকে বলা হচ্ছে? কার কাছে এ আবেদন?...দূরে সরে যেও না।

গান থেমেছে।

বন্ধনী-মা-র চড়া গলা। তাই বন্ধনী-মা-ই বলেছে, আসতে পারি ভেতরে?

ভেতর বলেছে—সুমধুর কণ্ঠ—নিশ্চয় নিশ্চয়।

ঘরে ঢুকে অবাক। কোনো ঠাকুর-দেবতার ছবি নেই। টেবিলটা টেনে আনা হয়েছে সৎময়জির সামনা সামনি।

টেবিলের ওপরে ল্যামিনেশান করা বড় ছবি। অন্য কারও নয়। সৎময়জির নিজের। দুপাশে পেতনের ফুলদানি—জয়পুরী নকশার।

হলুদ লাল কালো গোলাপী শাদা—পাঁচ রকম গোলাপে সাজানো ফুলদানি দুটি। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

ধূপদানিতে চন্দন ধূপ জ্বলছে। মনোরমা পরিবেশ। ঘরটি মন্দির মন্দির। কিন্তু সৎময়জিকে আশ্চর্য রকমের মানুষ মনে হচ্ছে। নিজেকেই ধ্যান করছেন। নিজেকেই গান শোনাচ্ছেন। নিজেই নিজেকে পুজো করছেন!

প্রশ্ন জেগেছে বনবীথির মনে। বনবীথি খুব মৃদুভাষী। মিষ্টি গলায় খুব আস্তে আস্তে বলেছে, কথা নয়ত যেন সেতারের ঝংকার।

এটাও কি আপনারই ছবি?

জোরে হেসে উঠেছেন সৎময়জি।—হ্যাঁ। আমিই আমাকে গান শোনাই। আমিই প্রার্থনা করি আমার কাছে। আমার ভেতরে যে শক্তি আছে, সেই শক্তি জেগে উঠুক। সেই শুভশক্তি। বিচারশক্তি। আমার ভেতরে যে ক্রোধ লোভ হিংসা দুঃখ কষ্ট গিস গিস করছে, অপরকে আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে পাঞ্জা কষছে—এরা ঘুমিয়ে পড়ুক। ঘুমিয়ে পড়ুক। আমার ভেতরের মঙ্গল শান্তি আনন্দ যেন অপরের ভেতর

পরিপূর্ণ করে তোলে শান্তিতে আনন্দেতে। চতুর্দিকে মঙ্গলে মঙ্গলে ছয়লাপ হয়ে উঠুক।

যে ক্ষতি করেছে আমার, তারও মঙ্গল হোক। এ আমার রোজের প্রার্থনা। আমার কাছে আমারই প্রার্থনা। এ প্রার্থনা সবার। এ প্রার্থনা যদি নিজের কাছে নিজে প্রতিটি মানুষ করে রোজ, তাহলে বোধহয় হিংসে-দ্বেষ-লোভের শিকার কাউকে হতে হয় না। সংসার জীবনে সমাজ জীবনে দেশ-বিদেশেরও জীবনে শান্তি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুন্দর কথা শান্তির কথা আনন্দের কথা—সব ভুলে যাওয়ার কথা।

সব কথার উত্তরই সৎময়জি নিজে হতে দিয়েছেন। কি হবে দুঃখ করে! কি হবে কেঁদে-কেটে!

কুঞ্জার মনের আকাশের কালো মেঘ ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। আসছে আলো। আলোয় আলোয় ভরে উঠছে!

একটু আগে মধুনীপের ব্যবহারের জন্যে ভেতরে খুব যন্ত্রণা পেয়েছে।

সর্বহারা করেও মধুনীপ ছাড়ে নি তাকে। যেখানে যেখানে গান-বাজনার আসরে গেছে, সেখানেই অপদস্ত হতে হয়েছে ওদের। ওরা নাকি ঘৃণ্য। সমাজে মেশার অযোগ্য। ওরা জাদু বিদ্যায় ওস্তাদ। মানুষের রূপ-যৌবন আকর্ষণ করে নেয়। সমস্ত শক্তি হরণ করে নেয়। নিজেরা অপরের আয়ু নিয়ে বেঁচে আছে। ওদের বয়েসের গাছ-পাথর নেই। ওদের একদম বিশ্বাস করা যায় না। ওরা এক জনের ব্যাধি নিয়ে আর একজনকে চালান করে দেয়। সর্বনেশে মেয়ে দুজনে—কুঞ্জা আর কিন্নরী। ওদের খপ্পর মরণের খপ্পর। সাবধান। সাবধান।

এসব ভুলতে চেয়েছে কুঞ্জা।

ভোলার ওষুধ পেয়ে গেছে। ভেতরে একটা গানই গুন গুন করে গেয়ে উঠেছে—যিসনে দিয়া হ্যায় দর্দে দিল উনকো খুদা দোয়া করে...।

মুক্তি চাইলেই সহজে মুক্তি পাওয়া যায়?

যায় না যায় না।

কুঞ্জা মধুনীপকে মন থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে।

পেরেছে কি?

গান হচ্ছে ওর প্রাণ। গানে যখন মন দেয়, সেইটুকু সময় বোধহয় ছিন্ন হয়ে যায় ওর কাছে অন্য জগৎ। কিন্তু তারপর?

যার কাছ থেকে মুক্ত হতে চাওয়া, যাকে ভুলে থাকতে চাওয়া, সে মানুষ যদি কোনোদিন কোনো সময় রক্ত-মাংসের শরীরে সামনে এসে উপস্থিত হয়, তখুনই সামনে এসে দাঁড়ায় বিরাট অগ্নিপরীক্ষা।

সে পরীক্ষায় কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে কি সহজে?

বলা যায় না কিছু।

এক এক জনের কাছে এক এক রকমের উত্তর। এক এক রকমের যুক্তি। সবটাই যে ঠিক হবে এখন কোনো কথা নয়। মন গড়া মনের ধাবণা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটাই সম্ভব। আচমকা বিনা মেঘে বজ্রপাত।

কুঞ্জা গানের খাতা নিয়ে স্বরলিপি ঠিক করছে একা ঘরে বসে।

মোটামুটি মনকে স্থির করে ফেলেছে। মধুনীপ-পর্ব আর তুলবেও না। শুনবেও না। নিজেকে নিয়েই নিজে থাকবে। নিজের প্রাণের গান আর নিজের সুন্দর গানের জগৎকে নিয়ে।

সিনথেসাইজারটা খাট থেকে তুলে নিয়ে চেয়ারে কোলে নিয়ে বসেছে। সামনের টেবিলে গানের খাতা। স্বরলিপি ধরে ধরে তুলছে আপনমনে।

'কুঞ্জা'।

চমকে উঠেছে উঠেছে কুঞ্জা। কে-এ-এ

মধুনীপ তুমি! এ কি দশা!

শতছিন্ন তালি দেয়া জামা-প্যান্ট পরনে। উস্কোখুস্কো রুখু চুল। কতদিন তেল পড়েনি কে জানে! কোটরে বসে গেছে চোখ, কোলে কালি। হাঁপাচ্ছে। রঙের আর সে জেল্লা নেই।

কুঞ্জা, ক্ষমা কর। যা করেছি আমি তার সাজাও পেয়েছি হাতে হাতে। অন্যায় করে কত লোকে বাড়ি গাড়ি করে বেড়াচ্ছে। বেড়াচ্ছে না এই দুনিয়ায়?

আমার ধাতে সইল না। সইবে না। বেশ বুঝতে পেরেছি। আর কি ফিরে আসা যায় না তোমার কাছে?

এতক্ষণ নীরব-নিশ্চুপ কুঞ্জা।

না বলতে গিয়ে মুখে বেধেছে। বলতে পারে নি।

শুধু নিশ্বাস। ধীর গতিতে বুক থেকে বেরিয়ে এসেছে।

হাতের সোনার বালা দুটো আর গলার চেন হার খুলে কাঁপা হাতে তুলে দিয়েছে মধুনীপের হাতে।

দু চোখের জল টস টস করে পড়েছে দু গাল বেয়ে।

বালা হার নিয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে একবার মধুনীপ। —না, আশেপাশে কেউ নেই। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

দু চোখে দু হাত চাপা কুঞ্জার। কান্না আর কান্না।

লম্বা বড় বারান্দা। শেষের ঘর থেকে মধুনীপকে স্বচক্ষে বেরুতে দেখেছে বন্ধনী-

মা। ভেবেছে আবার এখানে কেন? গিয়েই দু চার ঘা বসিয়ে দেবে পিঠে।

ভারী শরীরের মানুষ। আসতে আসতে মধুনীপ অদৃশ্য।

কিন্নরী বন্ধনী-মায়ের ঘরেই বসে। বন্ধনী-মাকে আসতে দেখে ও-ও সঙ্গে আসছে। সমানে সমানে পা ফেলে ফেলে।

দুজনে ঘরে ঢুকেই অবাক।

কুঞ্জা কেঁদেই চলছে। হাতে গলায় কিছু নেই।

কিন্নরী আর বন্ধনী-মা দুজনে মিলে জড়িয়ে ধরেছে কুঞ্জাকে। —কেন, কেন কাঁদছিস? ডাকতে পারলি না! ডাকাতটা কেড়ে নিয়ে গেছে নিশ্চয়।

ঘাড় নেড়েছে কুঞ্জা। —না, কেড়ে নিয়ে যায় নি। নিজেই দিয়েছে সে।

ত্রিভুবনে এরকম আহাম্মক মেয়ে দেখি নি তোর মতো। সর্বনেশে মেয়ে। সর্বস্ব নিয়ে যে পথে বসিয়ে গেছে, তাকে ভালোবেসে হার, বালা খুলে দেয়া হয়েছে। আশ্চর্য।

ছি ছি ছি! লজ্জায় মরি ঘেন্নায় মরি।

হ্যাঁরে, কুঞ্জা! তোর কি এখনও ডাকাতটার ওপর ভালোবাসা রয়েছে? আচ্ছা সত্যি করে বল তো কোন মুখে কোন সাহসে আসে সে এখানে! তলায় তলায় যোগ-সাজশ নাও থাকলে! কে না বোঝে! কেঁদে কেটে কত আর লোক ঠকাবি।

বিয়ে করতে ইচ্ছে করে? খুলে বল। চাঁদা তুলে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দেব। বে-শরম বেহায়া কোথাকার।

বালা, হারটা তখন নিয়ে রেখে দিলেই হতো। এখন ভাবি কি ভুলই না করেছি। ঝকমারি ঝকমারি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে কুঞ্জা।

কিন্নরীর হাত থেকে বালা খুলছে।

চোখ-পাকিয়ে তেড়ে এসেছে বন্ধনী। চুলের বিনুনি দুটো ধরে—বোনের বালা খুলছিস কেন?

কান্না ভেজা গলায় বলেছে কুঞ্জা। —তোমার কাছে রেখে দাও।

ওঃ। বিষ নেই কুলোপনা চক্র আছে। যদুর দোষে মধুর দণ্ড!

কুঞ্জার হাতটা ধরে কিন্নরীর হাতের ওপর থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে ধাক্কা মেরে।

খাটের ওপর ছিটকে পড়েছে কুঞ্জা।

বন্ধনী-মা নিজেই এগিয়ে এসেছ কুঞ্জাকে ধরে তুলে বসিয়েছে। পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছে, লেগেছে তোর! তোরা কেউ বুঝলি না আমায়। তোদের এক গুণ

লাগলে আমার শত গুণ লাগে রে। বন্ধনী-মা-র দু চোখ জলে ভরে উঠেছে। ধরা গলায় বলেছে, মায়ের যন্ত্রণা মেয়ে হয়ে বুঝবি কি? আমার বাইরেটাই দেখলি শুধু তোরা। ভেতর দেখলি না। দেখবার কেউ নেই। কেউ নেই।

নিজের হাতের সোনার বালা, গলার গোট হার খুলে পরিয়ে দিয়েছে।

মাথা নেড়ে পরতে চায় নি কুঞ্জা। বন্ধনী-মা বলেছে, তুই ছেলে মানুষ! হাত খালি থাকবে আর আমি পরে ঘুরে বেড়াব! সে হয় না। হতে দেব না জীবন থাকতে।

কুঞ্জার দু গালে চুমু খেয়ে বলেছে বন্ধনী-মা, মনে কিছু করিস নে। মাথা গরম হলে আমার কোনো জ্ঞান থাকে না। হাত-পা দুই-ই চলে।

কুঞ্জা জড়িয়ে ধরেছে বন্ধনী-মাকে।

চোখের জলে বন্ধনী-মা-র বুকের কাপড় ভিজেছে। বুকে মাথা ঘষছে, মুখ ঘষছে কুঞ্জা। অস্ফুট মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে—মা-মা-মা...।

একটু তফাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিন্নরী। দুচোখ উপচে জলের ধারা নামছে।



শরৎ-পূর্ণিমা। আকাশে জোছনা আর মেঘের খেলা। টুকরো টুকরো মেঘ এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। সরে যাচ্ছে। দূরে যাচ্ছে। হারিয়েও যাচ্ছে। সুন্দর মিষ্টি বাজনা ভেসে আসছে অতিথি-আলয়ের তিনতলা থেকে। মনে হচ্ছে অর্গানের। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনেছে অঙ্কুর। মনে হবে কেন, সত্যি অর্গান। ভারি সুন্দর লাগছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে।

বেশ খানিক আগে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। ভিজিয়ে দিয়ে গেল রাস্তাঘাট ফুলবাগান। মনটাকে কি ভেজাতে পেরেছে? পেরেছে বৈকি।

গানের সুরের কথার তান লয়ে ধুয়েছে মন, ভিজেছে প্রাণ। গানটা খুব জানা। অনেক অনেক শোনা। কত বার মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে শুনেছে অঙ্কুর। ঘুমিয়ে পড়েছে।

যখুনি দুরন্তপনায় মা 'পাগল-পাগল' হয়ে উঠেছে, তখুনি জোর করে ধরে এনে কোলে শুইয়ে এই গানটি গেয়েছে—রাতের দুষ্টুমিতে। দিনে অন্য গান।

রাতের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং...নটা বেজেছে। তিনজনে মিলে গান গাইছে। কখনও এক সঙ্গে। কখনও এক এক কলি এক এক জন।

বনবীথি, বনবীথির মা মোহিতা, বনবীথির মেয়ে ঝুলন।

'এমন জোছনা রাতে
নিদ নাহি আঁখি পাতে
কেন বাঁশি এত জ্বালায় আমারে
বলাতে তো নাহি মানে
সে যে বেড়ায় নিজ মনে
কেমনে তুষিব তাহারে
কেন বাঁশি এত জ্বালায় আমারে
বন মাঝে বাজে বাঁশি
শুনে আমি হই উদাসী
ধৈরয ধরিতে নারিরে'

গান শেষে ঝুলন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। অঙ্কুর ওপর দিকে তাকিয়েছে। দেখে ঘর থেকে ঝুলন বেরিয়ে আসছে। ওর প্রিয় সাজ পরনে।

লালচে চুলের বিনুনি পিঠ বেয়ে ঝুলছে কোমর অবধি। দু কানে মুক্তোর ঝুমকো। গলায় মুক্তোর হার। হাতে মুক্তোর বালা। গারারা, পাঞ্জাবি, জরির কাজ করা নীল ভেলভেটের জ্যাকেট।

অঙ্গে অঙ্গে রূপের ছটা বেরিয়ে আসছে। রূপের সঙ্গে মানানসই বেশবাস। চাঁপা রঙের ওড়নায় বুক থেকে মাথার অর্ধেক অব্দি ঢাকা। বাকিটা ওপর দিয়ে ঝুলছে।

বনবীথি হাসতে হাসতে বলেছে, আও বেটে! গুস্‌সা মত করে। আভি তুম অকেলি গাওগি। হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছে ভেতরে।

বনবীথির সাজসজ্জা সাধারণ। পাড় ছায়া শাদা সিল্কের শাড়ি। হাত অব্দি একই রঙের জামা। বনবীথি আর ঝুলন দুজনে পাশাপাশি দাঁড়ালে হলফ করে কেউ বলতে পারবে না মা-মেয়ে। যেন বড় ছোট বোন।

যতবার দেখেছে অঙ্কুর, ততবারই ভেবেছে চেহারা রাখার গোপন সাধনা নিশ্চয় একটা কিছু আছে। বয়েসকে কেমন করে থামিয়ে দেয়া যায়, কেমন করে সুন্দর করে তোলা যায়, মানুষের চোখকে কেমন করে ধোঁকা দেয়া যায়।

এ এক ম্যাজিক।

ম্যাজিকই বা বলা যায় কি করে? ম্যাজিকে তো অনেক লুকোচুরি ব্যাপার। চেহারায় তো তার উপায় নেই। রঙ মাখামাখির ব্যাপার না থাকলে দিনের আলোর মতো স্পষ্টই ধরা পড়ে। বনবীথির কাছে সবই আসল। নকলের কোনো বালাই নেই। আচার-আচরণে কথায়-বার্তায় আতিথেয়তা দরদী মন উজাড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এটা বলে ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার পড়ে না।

বছর ঘুরে চলেছে। সেটা ভালো রকমই জেনেছে অঙ্কুর।

এবার ঘরের ভেতর থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। কোকিল পাপিয়া না বুলবুল। ঝুলনের গলায় কোন বিশেষণ বসাবে অঙ্কুর খুঁজে পাচ্ছে না। সব চেয়ে অদ্ভুত লাগছে যে গানটা প্রায়ই অঙ্কুর গায় রাত্তিরে, সেই গানটাই শুনছে। সেই কথা। সেই সুর। সেই ঢঙ।

সামনে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে চোখ-মুখের ভাবটা সেই রকম কি না। বড্ড ইচ্ছে করছে। তিন তলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গিয়েও পিছিয়ে এসেছে। না না। এটা অভদ্রতা। অসভ্যতা। আজ অব্দি তিন তলায় ওঠেনি সে। ঝুলনও নামে নি। দুজনে সামনা সামনি চোখাচুখি হয় নি। যা কিছু শোনা দূর থেকে দেখা—সমস্তই দূরের। কাছাকাছি থেকেও দোতলা তিনতলা এতটুকু পাশাপাশি আসে নি। কুঞ্জার সঙ্গে খুবই

দোস্তি। কুঞ্জা ঝুলন প্রায় সমবয়সী।

কুঞ্জা ওর রূপে-গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ওর রূপ-গুণের গরিমায় কুঞ্জার গরব।

বারান্দায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না আর অঙ্কুর। ছুটে এসেছে কুঞ্জার ঘরে। ইচ্ছের কথা শুনে কুঞ্জা বলেছে, এখুনি নয়। পরিচয় হওয়ার সময়ে ঠিকই হবে। অধৈর্য হয়ো না। সময়ের অপেক্ষা কর। ও মেয়ে ভয়ানক খামখেয়ালি। ওর ভাবের ঘরে চুরি ও সইতে পারবে না। ভাবে বাধা পড়লে চিরদিনের বন্ধুত্বের আশা মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে। ভীষণ গোঁ।

দিল লেকে দিন চলে গ্যয়ে
বেদরদি কা কেয়া হোগা
খো গ্যয়ে দিল খো জানে দো
জিনা মরনা কেয়া হোগা
মহব্বত মে জিসকে নফরত
আঁসু বহানেসে কেয়া হোগা
দিল মে জিসকো দিল নহি হ্যায়
লাখোঁ আরজি কেয়া হোগি
লাখোঁ ওয়াদা কেয়া হোগা

আমার ভালোবাসা আমার প্রাণ, আমার স্বপ্নকে মুঠোয় পুরে নিয়ে গেছে বেদরদী। এতে বেদরদীর তাপ-উত্তাপ, দুঃখ-কষ্ট কিছুই নেই। কান্নারও কোনো দাম নেই। প্রেমের ওপর যার ঘেন্না, তার কাছে লাখো আবেদন করে কোনো লাভ নেই। তার লাখো প্রতিশ্রুতিরও কোনো দাম নেই। বৃথা বৃথা বৃথা।

অঙ্কুর মুগ্ধ-তন্ময়।

সচেতন করে তুলেছে কুঞ্জা। হাত ধরে বলেছে, ঘরে চল। শোয়ার সময় হয়েছে।

প্রবল ইচ্ছে মানুষকে পথ দেখিয়ে দেয়। সময়টাকে ছোট করে নিয়ে আসে। কাছাকাছি করে নিয়ে আসে। এখানেও তাই ঘটেছে। এ গানটা এসে অব্দি অঙ্কুর শোনে নি। পুরনো দিনের গান ভালোবাসে অঙ্কুর। দেখা গেছে তিনতলাও ভালোবাসে। তিনতলার ওরা পুরনো দিনের গান গায়।

অঙ্কুর শোনে। কখনও ঘর থেকে কখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে। শোনে। ভালো লাগে। আলাপের প্রবল ইচ্ছে এতটা প্রবল হয়ে ওঠে নি এর আগে।

এ গানটার অদ্ভুত সম্মোহিনী শক্তি। সামনাসামনি দেখার কথা কওয়ার জন্যে অস্থির দাপাদাপি ভেতরে। জানিয়েছে কুঞ্জাকে।

কুঞ্জার উপদেশ, 'সময়ের অপেক্ষা।'

মন মেনে নিতে পারে নি। মেনে নিতে পারছে না। অতএব কি করা!

কুঞ্জা বলেছে, সব খুলে না বললে তুমি মুশকিলে পড়ে যাবে।

ঝুলন তখন বছর পাঁচেকের। শাহজাহান দেখতে গিয়ে থিয়েটারেই ওর মাথায় ভূত চাপল।

কিসের ভূত?

না জাহানারার পোশাকের ভূত।

বাড়িতে এসেও সে জাহানার পোশাক পরবেই। কারও নিস্তার নেই। মেয়ের দিনরাত চিৎকার আর কান্না। শেষে দর্জি ডেকে পোশাক বানান হয়েছে। পোশাক আসতে দেখা গেছে ঝুলনের বিশেষ পরিবর্তন। ও রোজ ঠিক সন্ধ্যের কিছু আগে পোশাকটা পরিয়ে দিতে বলেছে বনবীথিকে। চোখে সুর্মা লাগিয়ে দিতেও বলেছে।

এরপর ওর আশ্চর্যজনক রকমের আচরণ শুরু হয়েছে। যদিও অল্প সময়ের জন্যে। আচরণ বলতে কোনো অনাসৃষ্টি নয়। বড় আয়নার সামনে গিয়ে চেয়ারে চোখ বুজে বসে থাকা। এই পনের মিনিট মতো হবে। তারপর অবাক হওয়ার পালা। চোখ চেয়ে চেনা মানুষকে চিনতে পারে নি। চেনা গলার আওয়াজে চেতনা হয় নি। এও ঐরকম দশ-পনের মিনিট হবে। এটা রোজের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ ঝুলন বড় হয়েছে। লেখা-পড়া শিখেছে। গান-বাজনা শিখেছে। কিন্তু আমার মনে হয় এখনও সেই পাঁচ বছরের। সন্ধ্যে নামবার আগে ও আবার ফিরে যায় আগের বয়েসে। আগের থেকে এতটুকু পাল্টায় নি।

কেন এমন হয়?

ঝুলন কেন করে? কিছু বলে কি?

কি চায়? কি দেখে? কি বোঝে?

না। কোনো উত্তর কিছু পায় নি কেউ। না ডাক্তার না কবিরাজ না সাধুসন্ত। 'কেন' খুঁজতে কম চেষ্টা হয় নি। খুঁজতে খুঁজতে সমুদ্রের ঢেউ তোলপাড় হয়ে গেছে। বনবীথির ঐ একটাই ভাবনা, আজ সে আছে, কাল যখন থাকবে না! কিন্তু থাকবে না থাকবে না ভাবলেও তো চলে না। বনবীথির জন্যে দুঃখ সবার। চিকিৎসার দুনিয়া থেকে সাধুসন্তদের আখড়া-আশ্রম পর্যন্ত দুঃখ, সমবেদনার ঢল নামছে তো নামছেই। নেমেই চলেছে। অনন্ত কাল ধরে এই নামার গতিকে কেউ আটকাতে পারবে না বুঝি। পারছে না যে দেখাই যাচ্ছে। কেউ পারবে বলে কারও ওপর কোনো ভরসা করা যাচ্ছে না। যখন ও নিজের মধ্যে নিজে থাকে না, ঐ সময়টা বাদ দিয়ে

ওর মন যখন আনন্দের দোলায় দোলে, সেই সুযোগে পরিচয় করাটা বোধহয় মাহেন্দ্রক্ষণ হয়ে উঠবে।

কুঞ্জার সেই ভয়। পরিচয় করাতে গিয়ে বিপরীত ফল না ফলে যায়। বিচ্ছিন্ন। মুখ দেখাদেঁখি বন্ধ। পিঠে হাত চাপড়ে অঙ্কুরকে বলেছে কুঞ্জা—শান্ত। নিজেকে নিজে স্থির কর।



কদিন ধরেই অঙ্কুর স্বস্তি শান্তি পাচ্ছে না এতটুকু। শুয়ে বসে কাজের মধ্যে দিয়ে, কোনোটাতেই নয়। কোর্টে গিয়েও আইন-কানুনে ভুলভাল করে ফেলেছে। রাতে চোখ-পাতায় এক করা মুশকিল। গানটাকে জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছে ছোটবেলা থেকে। সুখে দুখে শোকে গান তার নিঃশত্রু সঙ্গী। গানই শান্তি দিয়েছে। কাজে প্রেরণা যুগিয়েছে। আনন্দে ডুবিয়েছে। অশান্তি ভুলিয়েছে।

আজ সে গানও বন্ধ। গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না।

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে।

কুঞ্জা এসে বলেছে, এরকম করে নিজেকে নিজের অজান্তে ক্ষয় করে ফেলা ভালো নয়। মানুষের অসুখ কি হয় না! হলেই কি চলে যায়! এ দুর্ভাবনাকে সরিয়ে ফেল। মুছে ফেল।

দিনরাত ঘরের মধ্যে পাগলের মতো পায়চারি না করে একটু ঘুরেফিরে এসো বাইরে। না যেতে ইচ্ছে করে সৎময়জির কাছে যাও। গেলে অন্ত কিছুক্ষণের জন্যেও শান্তি পেতে পার।

খাটের পাশে বসে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে কুঞ্জা, ওকি! মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন! সামনের আয়নার দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার দেখেছে। দুচোখে জল ওপচাচ্ছে।

শাসনের সুরে কুঞ্জা বলেছে, যদিও তার বুকে বাঁধছে, তারও ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠছে, তবু যতটা পারছে নিজেকে সংযত করে বলেছে, ছেলেমানুষী কোরো না। কান্নাতে আমার বড় ভয়। আমার জীবনে দেখেছি যখুনি কান্না এসেছে, তখুনি একটা অলুক্ষুণে কাণ্ড ঘটে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে চিবুক ধরেছে কুঞ্জা। —ডাক্তারদের মুখের কথা শুনে তুমি কি ভেঙে পড়ছ? আমার মন মেনে নিচ্ছে না। ঝুলন চলে যেতে পারে না এত শিগগীর। ও যাবে না।

সৎময়জি বলেছেন, ও যাবে না। একটু ভোগান্তি—এই যা।

ডাক্তাররা বলেছে, ডবল নিউমোনিয়া। রুগীর অবস্থা খুব ভালোর দিকে নয়। তবে চেষ্টা চলছে। ডাক্তাররা অনেক কথাই বলে। এক ওষুধে বেঁচে ওঠে রুগী। সেই ওষুধেই আবার মারা যায় অন্য। এটা তো চাক্ষুষ প্রমাণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে মনের জোরে অনক অসাধ্য সাধন হয়। ঝুলনের মনের জোরে একটুও খামতি পড়েনি।

দেখে মনে হয় না অসুস্থ। সাজগোজ ধোপ-দুরস্ত।

ঘরে ঢুকলেই মুখে অজানা মিষ্টি হাসি। ওর মুখের হাসির চেয়ে চোখের হাসি বেশি ভালো। চোখই বেশি হাসে। বেশি কথা কয়। ইশারায় কথা কয়। গেলে গান শোনাতে বলে।

ডাক্তারের আদেশ বেশি কথা না বলার। আনন্দ আসুক। উত্তেজনা যেন না আসে। কুঞ্জা গেছে। কি খুশি!

ক্ষীণ কণ্ঠে গান গাইতে বলেছে।

গেয়েছে কুঞ্জা।

'তুমি আমায় ভালোবাস আমি তোমায় ভালোবাসি
স্বপন ঘোরে আনমনে তাই তোমার কাছে ছুটে আসি
তুমি আমার ব্যথার ব্যথি ঢাল প্রাণে সুধার ধারা
টেনে নাও বুকের মাঝে হই যখন আপনহারা
মুছিয়ে দাও নয়ন কোণে সোহাগ ভ'রে অশ্রুরাশি
ভুলিয়ে দাও সকল ব্যথায় হেসে তোমার মোহন হাসি'

ঝুলনের মুখে হাসি ফুটেছে। সারা মুখে ছেয়ে গেছে মোহন হাসির ছোঁয়া।

একটু ঝুঁকে পড়ে কুঞ্জা ওর দু গালে আর কপালে চুমু খেয়েছে।

ছাড়তে চায় নি ঝুলন। ইশারায় ওর পাশে শুয়ে থাকতে বলেছে। পাশে দাঁড়িয়ে বনবীথি। ঘাড় ফিরিয়ে বনবীথির মুখের দিকে তাকিয়েছে কুঞ্জা। কি করবে কুঞ্জা! বনবীথি চোখের ইশারায় বলেছে, শুয়ে থাক।

কুঞ্জার বুকে হাত রেখে নিশ্চিন্তে সুস্থ মানুষের মতো ঘুমিয়ে পড়েছে ঝুলন।

ডাক্তার এসে এ দৃশ্য দেখে বলেছে, ভয়ের মেঘ কাটবে নিশ্চয়। আমার বিশ্বাস ঝুলন যদি এই ভাবে আনন্দ শান্তি পায় ও নিশ্চয় স্বাভাবিক সুস্থ হয়ে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি।

দেখতে এসেও ডাক্তার আর দেখেনি। ফিরে গেছে। বলেছে, ওষুধের চেয়েও মহাওষুধ ঝুলনের এই আনন্দে ডুবে থাকা অবস্থাটা। এটা সাত তাড়াতাড়ি ভেঙে দেয়া উচিত হবে না। মোটেই না।

অঙ্কুরের হাত দুটো ধরে কুঞ্জা বলেছে সমস্ত। ঝুলন ভালো হয়ে উঠছে। মনোকষ্টের কারণ নেই তোমার। আমি প্রার্থনা করছি দিনরাত—আমার প্রয়োজন নেই কিন্তু ঝুলনের বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আমার প্রাণ দিয়েও ওকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

একটু হেসে বলেছে কুঞ্জা, অঙ্কুর, তুমি কি ঝুলনকে ভালোবাস! আলাপ পরিচয় কিছুই তো হয় নি এতদিনে! কিসে এত ভালোবাসা এসেছে?

কুঞ্জা! ভালোবাসি কি তা জানি না। ভালোবাসা কাকে বলে তাও বুঝি না। প্রথম জীবনে যে আঘাত পেয়ে এখানে এসে উঠেছি, সেই ভয়। সে আঘাত অন্য ধরনের। কিন্তু এ আঘাত আমার মর্মছেঁড়া। আমি ভালোবাসি গান। ওর গান শুনে শুনে ওর গানটাকে ভালোবেসেছি। মানে ভালো লেগেছে। সে ভালোলাগাকে যদি ভালোবাসা বল, তবে তাই।

জোরে নিশ্বাস পড়েছে কুঞ্জার। পিঠে হাত চাপড়ে বলেছে, নিশ্চয় ঝুলন ভালো হয়ে উঠবে। এই বিশ্বাস একদম ভাঙবে না। ভালো হবেই হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কুঞ্জা।

অঙ্কুরের অনেকটা মনোবল ফিরে এসেছে। ভগবান জানে না। দেবদেবী জানে না। পুজোপাঠ করে নি কোনো দিন। কোনো অনুষ্ঠান, কোনো কিছুতেই যোগ দেয় নি। কেমন করে প্রার্থনা করতে হয় তাও জানে না। কী বলতে হয়, তাও জানে না।

গেছে সৎময়জির ঘরে।

সৎময়জি নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিছুক্ষণ।

অঙ্কুরের মনের অবস্থার কথা কিছুই শোনেন নি। দাঁড়িয়ে থেকে থেকেই বলেছেন, তুমি কেন এসেছ জানি। কাকে প্রার্থনা করবে! কে তোমার কথা শুনবে! প্রতিকার? হা হা করে হেসে উঠেছেন সৎময়জি। কে কার প্রতিকার করে! কে কার প্রতিকার করবে! নিজেকে নিজেকে জাগিয়ে তোল। নিজের কাছে নিজে প্রার্থনা কর। তোমার প্রাণের কাছে তোমার মনের কাছে। মন-প্রাণ যেন সদা-সর্বদা একটা কথাই উচ্চারণ করে—ঝুলনের রোগ-ব্যাধি নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ। তোমার ভেতরের চোখ যেন দেখে ঝুলনের হাসিমুখ। তোমার দু-কান যেন শুনতে পায় ঝুলনের মধুর কণ্ঠের গান। আগেকার শোনা গান। তোমার পছন্দসই গান।

শেষে মনে মনে বলবে, জগতের সবার মঙ্গল হোক। সকলে দেহে মনে সুস্থ হয়ে উঠুক। সকলের ভেতরে শুভ-শক্তি জেগে উঠুক। দেশে-বিদেশে সকলের প্রাণে প্রাণে। সকলের প্রাণে প্রাণে বয়ে যাক বিচার-শক্তির আনন্দধারা।

শেষের কথা কটি ঝুলন কেন পৃথিবীর সব লোকের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজন

ঐ প্রার্থনা। ভবিষ্যতে পরিবার সমাজ দেশ-বিদেশে শান্তি আনার জন্যে। আগুন নেভানোর জন্যে।

বলেই সৎময়জি নিজের ছবির চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে গেয়ে উঠেছেন—

'জানি তুমি মঙ্গলময়
প্রতি পলকে তার পাই পরিচয়'

আদেশের সুরে বলেছেন, এটুকু মনে রাখবে তোমরা মানুষ। জন্তু-জানোয়ার নও। বা মানুষের খোলসে পশু নও।

তোমরা মঙ্গলময়। সকলের মঙ্গল।



চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকলেও বনবীথিব ভেতরটা দিবারাত্রিই কেঁদেছে।

কেন না মণিমন মারা গেছে ডবল নিউমোনিয়ায়। সেই ভয় বনবীথির। তার কি বুক খালি, কোল খালি করবে দুজনেই! সেই জন্যেই কি এদের আসা!

মণিমনের তখন বয়েস পাঁচ। রাখা যায় নি। থাকবে না বলেই এসেছে।

ঝুলন এতদিন থেকে তাকে আরও দাগা দিয়ে কি চলে যাবে শেষে?

বনবীথির ভেতর বলেছে, তুমি শক্ত মনের মানুষ বলে সবাই জানে। ভেঙে পড়লে চলবে না। ঝুলন যাবে না। যাবে না।

সকলে এক সঙ্গে প্রার্থনা করলে ইচ্ছে করলে যে ফল হয়, সে জিনিসটা বনবীথি এখন বুঝতে পেরেছে।

আশ্চর্যভাবে ঝুলন ভালো হয়ে উঠেছে। গোটা বাড়িটার ছমছমে থমথমে ভয় সরেছে। কালো ছায়া মরণের থাবা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, সেও পালিয়েছে।

কেউ বিশ্বাস করুক না করুক ইচ্ছাশক্তির যে জয় হয়, সবটাই যে কাকতালীয় নয়, এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে বসেছে বনবীথির মনে।

এখন ঝুলনকে দেখে কেউই বলতে পারবে না এই মেয়েকে নিয়ে দু মাস ধরে যমে-মানুষে টানাটানি হয়ে গেছে। এমনিতেই ঝুলনের মস্ত আকর্ষণ তার রূপ শুধু নয়, তার ঘুম ঘুম ঢুলু ঢুলু দু চোখ। ভারি সুন্দর দেখায়। সবার চাউনি থেকে ওর চাউনি সত্যিই আলাদা। তাই বুঝি সকলকেই কাছে টানে তার দু চোখ।

লালচে রঙের মুখে কুচকুচে কালো টানা ভুরু। যেন 'চিকন কালো ভুরুর তলে কাজল আঁখি দোলে রে...।'

ঝুলন মায়ের মতো অত গম্ভীর নয়। তবে একটা উদাসী বৈরাগীর ভাব প্রায় সময়েই ওকে পেয়ে বসে। এই উদাসী বৈরাগী তো সবার মধ্যে দেখা যায় না। এখানেও ঝুলন সকলের চেয়ে আলাদা। বিষণ্ণ মধুর। ওর মনের কথা বোঝার সাধ্যি নেই কারও। শিশুর সরল সহজ হাসি ঠোঁটের কোণে। অসুখ বিসুখেও কোনো অভিযোগ নেই কারও ওপরে। কোনো যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করে নি কোনো দিন

কোনো সময়ে কারও কাছে।

এখানে ঝুলন খুব চাপা মনের। এটা ওর লোক আকর্ষণ মস্ত সম্পদ।

ঝুলনকে বুঝতে যাওয়া জানতে চাওয়া সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে যাওয়ার সামিল। অতিথি-আলয় আজ আনন্দে মশগুল।

ফুলে ফুলে ছয়লাপ। একতলা দোতলা তিনতলা। শুধু গোলাপ আর গোলাপ। গোলাপের পাপড়ি। ঝুলন গোলাপ ভালোবাসে। লাল গোলাপ।

বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেরই নেমন্তন্ন।

বনবীথির ইচ্ছে। সবার ইচ্ছেই যখন ঝুলনের পুনর্জন্ম, তখন সকলের ইচ্ছের জয়ের উৎসবে প্রত্যেকের আসা চাই-ই।

এসেছে।

খুশির জোয়ারে গোটা বাড়ি ভরে উঠেছে। সকলের হাতেই তোড়া বাঁধা লাল গোলাপ। যে যেমন গান জানে, সে তেমন গেয়েছে।

প্রথম যখন অঙ্কুর এসেছে অতিথি-আলয়ে তখনকার মনোভাব নতুন করে আবার আজ এসে গেছে। বড় অশান্ত মন নিয়ে এসেছে। এসেছে মহাশক্তির আশ্রয়ে—স্বর্গে। আজ আবার নতুন করে অঙ্কুরের ভেতরটাও খুশিতে ভরপুর।

অঙ্কুর দোতলাতে নিজের ঘরে বসেই গাইছে। তখন রাত নটা। যারা এসেছে তারা ঝুলনকে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করার আশীর্বাদ ভালোবাসা জানিয়ে চলে গেছে।

সবার শেষে যাওয়ার পালা অঙ্কুরের।

কুঞ্জার অনুরোধ। —ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। একা একার পরিচয় গভীর হয়ে ওঠে।

কুঞ্জা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। অধীর প্রতীক্ষা আর সইছে না অঙ্কুরের। নিজের প্রিয় গানটা বাজাতে শুরু করেছে হারমোনিয়ামে। সুরে গলা মিলিয়ে গাইছে।

জিসনে দিয়া হ্যায় দর্দে দিল
উনকো খুদা দোয়া করে
আশিকে না মুরাদ কো
উনকো খুদা পুরি করে...

যখুনি গায় ও চোখ বুজেই গায়।

গান শেষে তাকিয়ে অবাক। একি সম্ভব! একি মনের ছবি!

ঝুলন হাসি মুখে সামনে দাঁড়িয়ে। তাকিয়ে রয়েছে এক দৃষ্টে।

তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাতের লাল গোলাপের তোড়াটা এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি গলায় ঝুলন বলেছে, এটা আপনি নিন। হাতে যেন কাঁটা না ফোটে।

মুখ দিয়ে কথা বেরতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে অঙ্কুরের। তোতলাতে তোতলাতে বলেছে, আপনি কষ্ট করে—কুঞ্জার সঙ্গে যাওয়ার কথা।

ঝুলন বলেছে, তাতে কি হয়েছে! অত কিন্তু বোধ করছেন কেন? আমার কি নামতে নেই নিচে! আপনাদের কাছে আসতে নেই।

না না না। তা হবে কেন? তা হবে কেন?

আমি আসি। অসুস্থ হওয়ার জন্যে আসতে পারি নি।

আচ্ছা, একটা কথা বলব?

বলুন।

'যিসনে দিয়া হ্যায়....' এ গানটা আপনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

আমার ওস্তাদজি নান্নে খাঁ-র কাছ থেকে।

নান্নে খাঁর গুরুভাই রেহান খাঁ আমার ওস্তাদজি। আশ্চর্য! একই ঘরানা আমাদের। কি রকম মিল দেখুন। কিন্তু অবাক কাণ্ড এই গানের শেষটা অনেক অনেক খুঁজেও পাইনি। গানটা আমার খুব ভালো লাগে।

আমারও সেই দশা।

কপালে ডান হাতের আঙুল ঠেকিয়ে ঝুলন বলে, একেই বলে কপাল। গানের টানেই আমি এসে পড়েছি আপনার কাছে।

ঘরে এসে পড়েছে কুঞ্জা। দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছে, কি আশ্চর্য! ঝুলনকে বসতেও বলা হয় নি অঙ্কুর। দাঁড়িযে আছ সেই থেকে। ছি ছি! কি লজ্জা কি লজ্জা। বোস ঝুলন। তুই বোস।

কুঞ্জা, আমি ওকে বলতে বলার সুযোগ দিলুম কোথায়! প্রশ্নের পর প্রশ্নই করে গেছি।

একটু গলা নামিয়ে ঝুলন বলেছে, তোর লজ্জা কেন রে? লজ্জাটাতো আমারই হওয়া উচিত। মানুষ কত স্বার্থপর হয় বল! নিজের স্বার্থটাই বড় হয়ে উঠেছে আমার।

কি সে তোর স্বার্থ বড় হলো—কুঞ্জার প্রশ্ন। —তোর স্বার্থ বলে কোনো জিনিস আছে, তাতো জানি না। আজ ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি।

আছে বৈ কি! তুই তো জানিস। এই একটা গান নিয়ে আমার পাগলামি। শেষ খুঁজে শেষ পাচ্ছি না। রবি ঠাকুরের গানের কথা মনে পড়ে। 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই/প্রহর হল শেষ।'

থাম। বাইশের মুখের কথা বাষট্টির কথা। পাবি পাবি। তোর প্রহরেই পাবি। প্রহর শেষ হবে না। শোন, আমি পেয়েছি।

ঝুলন আবেগে জড়িয়ে ধরেছে কুঞ্জাকে। —কুঞ্জা।

হ্যাঁ, বোস। গাইছি আমি।

কার কাছে পেলি? কার কাছে পেলি?

নিজের কাছে।

নিজের কাছে!

হ্যাঁ, নিজের কাছে। শোন।

আঁখো মে ইন্তেজার হ্যায়
দিল মে ইযাদ হ্যায়
মহব্বত কো জিন্দা রাখে
উনহি সে না জুদা করে

ঝুলন দু গালে দুই চুমু খেল কুঞ্জার।

সুন্দর লিখেছিস তুই। এইটাই ঠিক।

অঙ্কুরের দিকে চেয়ে বলেছে ঝুলন, তাই নয়! কি বলেন! মাথা নেড়ে এক গাল হেসে অঙ্কুর বলেছে, নিশ্চয়। এটাই ঠিক।

যাওয়ার সময় ঝুলন জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে অঙ্কুরকে বলে গেছে, আমি আসব কিন্তু মাঝে মাঝে। গানের প্রয়োজনেই আসব। আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?

জোড়হাত করে কথায় মিনতি এনে অঙ্কুর বলেছে, সে কি কথা! সে কি কথা! আমি কৃতার্থ হব। নিজেকে ধন্য মনে ধরব।

আপনিও ওপরে আসবেন।

অঙ্কুরের ঠোঁট দুটো নড়ে উঠেছে সবে। বলার আগেই বলেছে কুঞ্জা—আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব, তোর গান-বাজনার সময়ে।



'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে
আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাই নে তোমারে...'

এ ঠিক এই অবস্থা।

'শ্রবণের ভিতর দিয়া মরমে পাশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ'।

আকুল ব্যাকুল কি শুধু একজনেরই?

অঙ্কুরের?

তা কেন হবে?

গান পাগল ঝুলনেরও তো।

অঙ্কুর গান গায়।

ঝুলন তাড়াতাড়ি নেমে যায় দোতলায়, অঙ্কুরের ঘরে।

ঝুলন গান গায়, শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও কুঞ্জাকে তিনতলায় টেনে নিয়ে যায় অঙ্কুর ঝুলনের ঘরে।

যে গান শুনে অস্থিরতা বেড়ে উঠেছে অঙ্কুরের, ঝুলনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে, সে গান একই ঘরানার। কিরানা। তবে অঙ্কুর যখন গেয়েছে, সেটা শুনেই গলাতে বাজনাতে তুলে নিয়েছে ঝুলন। এটা তার ওস্তাদের কাছে শেখা নয়।

ঝুলন নিজেই স্বীকার করেছে, অঙ্কুরকে বলেছে, আপনার গান চুরি করি আমি।

এটা তো আমার একার সম্পত্তি নয়। সবারই প্রাপ্য। হাওয়ায় ভেসে ভেসে বেড়ায় যে, সে তো সকলের জন্যেই। সে ধরতে পারে, সে তারই। যে না পারে, তার নয়।

যখুনি ঝুলন বেরতে যায় অতিথি-আলয় থেকে, তখুনি গান শুরু করে দেয় নিজের ঘরে অঙ্কুর। ঝুলনের বাইরে যাওয়া বন্ধ। ফিরে আসে। উঠে আসে ওপরে। আসে পায়ে পায়ে অঙ্কুরের ঘরে।

সোফায় বসে চুপ করে শোনে এক মনে।

এই আসা যাওয়া, শোনাশুনির মধ্যে নিজেরা জানে না কতখানি তারা একে অন্যের হৃদয়ের কাছে পৌঁছে গেছে। নজর পড়েছে কুঞ্জার ! নজর পড়েছে বনবীথির আর দিশার বাবা নিগমের।

নিগমের সঙ্গে বনবীথিদের বহুদিনের বন্ধুত্ব।

নিগমের সুপারিশেই অঙ্কুরের এখানে থাকা।

নিগম মাঝে মাঝে আসে যায়। অঙ্কুরকে দেখে যায়।

নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বনবীথির কাছে কথাটা তোলে।—ছেলেটা খুবই ভালো। দেশের অবস্থাও ভালো। একটা ফ্ল্যাটও কিনছে। একটা ভালো মেয়ের সন্ধান—

কি বলতে চাইছে নিগম বনবীথি আন্দাজ করতে পারে। বলেছে, ঝুলনটার জন্যে আমারও তো চিন্তা। একটা নিজের ছেলের মতো জামাই—

কুঞ্জা দু জনের কথা লুফে নিয়ে বলেছে, কেন, বর তো কাছেই এসে গেছে। আর কনেও তো দাঁড়িয়েই আছে। বিধাতার লিখন না হয় খণ্ডন। সন্ধান নেয়ানেয়ি আর নাই বা হলো।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেও নিগম আর বনবীথি বলেছে, কে! কে!

হাসতে হাসতে বলেছে কুঞ্জা, কেন, ঝুলন আর অঙ্কুর।

একটা উর্দু গানের তর্জমা করছে দুজনে। কানে ওদের নাম যেতেই ওরা লজ্জায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

দোতলায় এসেছে দুজনে।

অঙ্কুরের ঘরে।

প্রথমে উর্দু গানটা গেয়েছে ঝুলন।

কাশ্মীরে যখন বেড়াতে গেছে, তখন কাশ্মীরিদেরই কাছ থেকে উর্দু গানটা কাশ্মীরিতে অনুবাদ করে নিয়েছে।

ঝুলন যখন যেখানে যায়, সেই দেশের গান সেই দেশের ভাষায় ও অভ্যেস করে নেয় রীতিমত। হুবহু তাদের সুরে তাদের ঢঙে গায়। গাইতে পারে।

এটা শেখার ওর খুব শখ।

প্রথমে গেয়েছে উর্দু।

গুজর গ্যয়ি মেরি তমান্না
ফির ভি য়ো নহি আয়ে
জিন্দগি বিত যাতি হ্যায়
ফিরভি য়ো নহি আয়ে
মহব্বত মে রোনা পড়া

হালত উঠানে পড়া
মহব্বত খো যা রহি
ফির ভি য়ো নহি আয়ে

আশা চলে যাচ্ছে। প্রাণও চলে যাওয়ার উপক্রম। তবুও সে আসে নি। ভালোবাসা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হতে বসেছে। তবু সে এল না।

এবার কাশ্মীরিতে—

মুসিদ গুয়ম চোন ইয়াদ
তোয় তে সে আখ নিকে
জিন্দেগি মকলে আম
তোয় তে সে আখ নিকে
মহব্বত পেট পিয়ম বাদুম
দুখ তুলুম ওয়া ওয়ারিয়া
তোয়ে তে সে আখ নিকে

কুঞ্জা এসেই হাততালি দিয়েছে। —বাঃ! সুন্দর।

'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়
সে কি মোর অপরাধ'

গাইতে গাইতে চিবুক ধরে নেড়ে দিয়েছে ঝুলনের।

আচমকা আনমনা হয়ে গেছে ঝুলন। কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে উঠে পড়েছে। ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেছে। ও যেন আর ওর মধ্যে নেই। কে যেন ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিসের টানে? কার টানে?

ঘরে গিয়েই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ঝুলন।

পেছু পেছু গেছে এরা দুজনে। কুঞ্জা আর অঙ্কুর।

অঙ্কুরের মুখের ওপরই দরজা বন্ধ।

এ কি রকম ব্যবহার!

নিচে নেমে এসেছে অঙ্কুর।

একটা নিদারুণ যন্ত্রণা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে।

ইতিহাস কি ঘুরে-ফিরে আসে? কিংবদন্তী থেকে শুরু করে আজও তো মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় এই কথা।

অঙ্কুর ঘরপোড়া গোরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় হওয়ারই কথা। যা ব্যবহার পেয়েছে দিশার কাছে! অবহেলা, লাঞ্ছনা, অপমান।

এখানেও কি সেইসব ফিরে আসার সম্ভাবনা।

কুঞ্জার মুখের দিকে তাকিয়েছে।

তুমি বড্ড স্পর্শকাতর।

আগের আতঙ্কটা কি এত তাড়াতাড়ি মুছে যায়?

না, মোছে না। তা বলে জলাতঙ্ক রুগীর মতো জল দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠবে, সেটাও ঠিক নয়। ঝুলন দিশা নয় জানবে। ঝুলন ঝুলনই। ঝুলনের তুলনা একমাত্র ঝুলন। মন থেকে কুচিন্তা সরিয়ে দাও। তার চেয়ে বরঞ্চ গান গাও!

আমাকে একটু স্থির হতে দাও। নিজেকে একটু সামলে নি। ঝুলনের ব্যবহার ভালো লাগে নি। গান গাইলে যদি ঝুলন নেমে আসে, আমি ওকে আগের মতো ঠিক আদর-আপ্যায়ন করতে পারব না বোধহয়।

তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। অন্তত আধ ঘণ্টার জন্যে সে নামবে না। তুমি যত গানই গাও না কেন, সে শুনবে না!

কেন? কার ধ্যানে-জ্ঞানে মেতে থাকে ঝুলন! যে শুনবে না নামবে না!

অজানা। একদম অজানা। ঝুলনের মা দিদিমা—বনবীথি আর মোহিতাও বলতে পারে না। বলতে পারবে না।

অঙ্কুর বলেছে ক্লান্ত স্বরে, সব কিছু আমার গুলিয়ে যাচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছি না। গরমের তাপ জুড়োতে এসে মরুভূমির বুকে আছাড় খাব না তো শেষে!

হেসেছে কুঞ্জা। তা বোধহয় না।

বোধহয় কেন বললে!

এ দিকটা তোমায় মেনে নিতে হবে। বুঝে সুঝে নামো। এটুকু তোমায় বলতে পারি, তুমি সুখি হবে। এমন সুখি বোধহয় কেউ হবে না পৃথিবীতে তোমার মতো। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। তবে কোনো সন্দেহ করা চলবে না। সন্ধের মুখোমুখি সময়টা সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। সে নিয়ে কোনো যুক্তিতর্কের মধ্যে যেতে পারবে না। জিগ্যেস করলে উত্তরও পাবে না। ও নিষ্পাপ। কোনো প্রেমিকের জন্যে এমন হয়ে পড়ে নি, এটা নিশ্চিত জেন।

সত্যিই তাই। আধ ঘণ্টা বাদে নেমে এসেছে আবার ঝুলন। আগের সেই মানুষ। সেই হাসিখুশি। সেই গানে মেতে ওঠা। একটু আগের কোনো লক্ষণই নেই—মুখের ওপর দরজা বন্ধ করা।

তিনজনে একসঙ্গে গেয়ে উঠেছে ভোজপুরি গান—

আইল ফাগুয়া সে না আইল রাম
মোরা পিয়া নিরদইয়া পাথল কি ছাতিয়া
নিদ নহি সখিয়া সারি সারি রাতিয়াঁ



বনবীথি নিজের কাছেই রাখতে চেয়েছে অঙ্কুরকে।

নিগম বলেছে, কতটুকু দূরেই বা ওর ফ্ল্যাট! এই দু চার পা। এত একরকম কাছেই থাকা।

বিয়ের সব ঠিকঠাক। সামনে দোল।

দোলটা কেটে যাওয়ার পরের সপ্তাহে প্রজাপতির নির্বন্ধ। শুভ পরিণয় ঝুলন আর অঙ্কুরের। কুঞ্জা নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে সুখবর জানিয়ে দিয়েছে। ছোটবড়, অতিথি, কাজকর্মের লোক—সকলেই খুশিতে ভর-ভরতি।

ব্যতিক্রম বন্ধমী-মা। এ বিয়েতে একদম রাজি নয়। বিয়ে করে কি শান্তি সুখ পাবে! আই ডোন্ট কেয়ার। রাখো রাখো। যার ঘটে একটু বুদ্ধি আছে, সে ফাঁদে পা দেবে না। ঝুলনটা বোকা। বোঝে না সোঝে না। বরাতে দুঃখু আছে অনেক।

নিজের বুকে ঘুষি মেরে বলেছে, কোনো আসক্তি নেই বন্ধনী-মা-র। নেই কোনো বন্ধন। দূরে সরিয়ে রেখেছি স্বামীকে। একমাত্র ছেলে, সেও দূরে। নিজে স্বাধীন। বন্ধনের মধ্যে কেউ যায়! বনবীথির মাথা খারাপ, তাই এই বিয়ে। বনবীথির মা-টাকে বলি! সেকেলে মহিলা। এ কালের হাল বুঝবে কেমন করে। তার আবার গান কত! আনন্দের ফোয়ারা প্রাণে সেকেলে গাইয়ে আঙুরবালার প্রথম দিককার গান। অঙ্কুরের দাড়ি ধরে আদর করে গেয়ে শোনাচ্ছে—আহা-হা কত সোহাগ! মরবার বয়েস হয়েছে শখ যায় নি।

বাঁধনা তরীখানি আমারই নদী কূলে
একাকী দাঁড়ায়ে আছি লহ না আমারে তুলে
কোথা হতে এস তুমি ভাসায়ে তরণীখানি
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে কোথা যাও হে নাহি জানি
না জেনে সঁপেছি প্রাণ সঁপেছি তোমারই কূলে
সাজায়ে এনেছি ডালা প্রেম নদীর তটে
শুনেছি তোমারই গান রাগিণীর ছায়ানটে
যাবে যাও হে প্রাণ সখা থেকো না আমারে ভুল

রাখো! রাখো! মরণ আর কি! এসব মানুষ বেঁচে থাকে ঘর ভাঙাবার জন্যে! ছ্যা ছ্যা!

বন্ধনী-মা গেছে চাঁদনির ঘরে। চাঁদনি নেই। চাঁদনির বর রয়েছে। লোহিত।

হ্যাঁ রে লোহিত! চাঁদনি কোথায়! বুঝেছিস তো পরদেশীকে বিয়ে করে! কি লাভ হলো তোর বল পরদেশীকে বিয়ে করে!

বন্ধনী-মা! নিজের বুদ্ধিতে মরাও ভালো।

ঘর থেকে বেরতে গিয়ে দেখে চাঁদনি সামনে।

কি কথাবার্তার ছিরি রে চাঁদনি! ঘর করিস কি করে! গোঁয়ার স্বামী! আমি হলে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে দূর করে দিতুম। মুখদর্শন করতুম না।

দাদা-বৌদির ঘরে গেছে বন্ধনী-মা। —কেমন আছ তোমরা?

ভালোই আছি, বৌদি বলেছে।

সে তো বুঝতেই পারছি কতখানি ভালো। ঘর-বাড়ি সর্বস্ব ত্যাগ এই বুড়ো স্বামীটার জন্যেই নয়! কর, সেবা কর। পতি পরম গুরু। বুড়ো স্বামীকে ক্ষীর ছানা ননী খাওয়াও আর দুর্গতি ভোগ কর। এ যেন দাসীবৃত্তি। ছ্যা ছ্যা! একেবারে ক্রীতদাসী। আমার ধাতে ওসব সইবে না।

বন্ধনী-মা-র মুখে এ সব কথা শুনে কুঞ্জা প্রমাদ গুনছে। শুভ কাছে বাধা আসে ঠিকই। কিন্তু বন্ধনী-মা-র এ কি গাত্রদাহ, ঝুলনের বিয়েতে! নিজের বাসনা-কামনা পূর্ণ না হওয়ার ক্ষোভ কি?

এ দিকে গোটা বাড়িটা হোলিতে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে বলে সাজানো গোছানো হচ্ছে। বিয়ের আগে মন খুশি উৎসব।

বন্ধনী-মা এমন করে প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে ঘর ভাঙাবার চেষ্টা। অশান্তির আগুন জ্বালাবার চেষ্টা।

বন্ধনী-মা-কে চেনা দায়। কখন হাসে। কখন কাঁদে। কখনও খাওয়ায়। কখনও লোকের দুঃখে কাতর। সুখে আরও কাতর—ঈর্ষা-কাতর।

ঝুলন অঙ্কুরের কানে গেলে কি মনের অবস্থা হবে ওদের!

বন্ধনী-মা বলে বলে বলি নি। করে বলে করি নি।

কুঞ্জা নিষেধ করেছে। তোমার এসব কথার কি ফল ফলবে জান তুমি! সদ্য ফোটা দুটো ফুলের মতো মনকে তুমি ছিঁড়ে খুঁড়ে তছনছ করে দিতে চাইছ।

গর্জে উঠেছে বন্ধনী-মা। —বলিস কি রে! আমি! আমায় কে না চেনে! তোরই গাত্রদাহ বেশি। তোর তো জীবনে কিছু হলো না। তুই-ই তো এইসব বলে বেড়াচ্ছিস।

এতবড় মিথ্যে কথা বলতে পারছ বন্ধনী-মা! নিজে বলে আমার ঘাড়ে চাপান! আলবাত বলে বেড়াব। তুই হিংসেয় মরছিস। বিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করছিস।

কাঁদতে কাঁদতে সৎময়জির কাছে কুঞ্জা হাজির।

সৎময়জি উপদেশ দিয়েছেন, কান্না নয়। এখন হাসির দিন। হাসির সময় এসে গেছে। আনন্দ কর। হাস। কে কী বলছে না বলছে, ও সবে কান দিও না। ও সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। শুধু শুধু মনোকষ্ট। সময় নষ্ট।

সৎময়জি তাঁর প্রিয় গানের কলিটা আবার গেয়ে উঠেছেন।

'জানি তুমি মঙ্গলময়
প্রতি পলকে তার পাই পরিচয়'

হোলির ভোর।

শাঁখ বাজিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে নিজের ছবিকে আরতি করেছে সৎময়জি। ফল ফুলে নানা রঙে রঙিন হয়ে আছে পৃথিবী। তার মধ্যে তুমিও রঙিন হয়ে ওঠ। সুন্দর হয়ে ওঠ। সকলের মিলনের তীর্থভূমি হয়ে ওঠ।

তুমি তুমি তুমি।

তোমার মধ্যে তোমারই প্রকাশ।

অতিথি-আলয়ের হোলি খেলা আবির বা রঙ দিয়ে নয়। ভালো আবির বা রঙ পাওয়া যায় না বলে। রঙিন ফেস পাউডারে মাখামাখি সকলে।

বন্ধনী-মা গালাগালি শুরু করে দিয়েছে।—মরণ আর কি! পাউডার নিয়ে আবির খেলা। এরকম কাণ্ডকারখানা দেখি নি। কি আর করে! মেলামেশা ছোঁয়াছুঁয়িটাতো চাই। ঐটাই লাভ। পাশ জানে কে লিয়ে বাহানা বানানা চাহিয়ে। কাছাকাছি, গা ঘেঁষাঘেঁষি করার জন্যে এই একটা বাহানা। ঘেন্নায় মরি। ঘেন্নায় মরি। দু চোক্ষে দেখতে পারি না। এসব ঢলাঢলি, নোংরামি অসহ্য। আর ঐ পাজি ছোঁড়াটা লোহিত। ঘুরে ঘুরে খালি ঝুলনের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। বেলেল্লাপনা-বেহায়াপনা আর কাকে বলে! একেবারে কোনো শৃঙ্খলা নেই। বন্ধনী-মাকে চেনে না এখনও কেউ। কেমন করে শৃঙ্খলা আনতে হয় দেখিয়ে দেবে। এক এক করে সব কটাকে বার করে দেবে এখান থেকে। নতুন করে ব্যবস্থা করবে বন্ধনী-মা নিজে। বনবীথির কোনো ভয় নেই। ভালো ভালো লোক এনে বসাবে।

রাগে গরগর করছে বন্ধনী-মা। ঝুলনটাকে মনে হয়েছে গো-বেচারা। অতি নচ্ছার। পাউডার মেখে মনে করছে কি সুন্দরীই না দেখাচ্ছে! সবচেয়ে বেশি

শয়তানী ঐ কুঞ্জা। বিয়ের ঘটকালি তো ও-ই করেছে। বন্ধনী-মা থাকলে কখনই এ বিয়ে দিতে দিত না। ছেলেটা কোথাকার কে জানে! মেয়েটার মাথা খারাপ। সন্ধে হলেই মানুষ চেনে না। ঐ কুঞ্জাই তো উদোর ঘাড়ে বুদো চাপাচ্ছে। এমন জানলে হাতের বালা খুলে দিতুম, না গলার হারটা!

বন্ধনী-মা-র ভাঙা কাঁসরের গলার আওয়াজ শুনতে কারও বাকি থাকছে না। হোলির আনন্দে যদিও মাতোয়ারা সকলে।

হাতের বালা, গলার হার খুলে কুঞ্জা বন্ধনী-মায়ের হাতে তুলে দিয়েছে।

এ আবার কি ন্যাকামি তোর! পেটে নেই ভাত/রাগে ওঠে হাত।

জোড়হাত করে কুঞ্জা বলেছে, না বন্ধনী-মা। দরকার হলে আবার চেয়ে পরব। এখন রেখে দাও তোমার কাছে।

তা বটে। তা বটে। লক্ষ্মীর অপমান করতে পারি না। লক্ষ্মী আমার ঘরে বাঁধা। তোরা অপমান করিস বলে তোদের ছায়াও মাড়ায় না মা লক্ষ্মী। আই ডোন্ট কেয়ার।

বালার ওপর বালা পরেছে বন্ধনী-মা। গলায় হারের ওপর হার।

বড় থালাতে পাউডার ঢালা রয়েছে। সবাই তুলছে নিচ্ছে আর খেলায় মেতে উঠছে।

বন্ধনী-মা থালা থেকে দু মুঠো পাউডার তুলে নিয়ে নিজেই নিজের মুখে মেখে নিয়ে চিৎকার করে বলতে শুরু করেছে, ওমা একি গো! আমায় আবার কেন দিচ্ছিস তোরা!



ধুমধাম করে ঝুলন অঙ্কুরের বিয়ে হয়ে গেছে।

নিজের ঘরে বসেই গজ গজ করেছে বন্ধনী-মা। শাপ-শাপান্তের অন্ত নেই। কুঞ্জার আদ্যশ্রাদ্ধ। বনবীথির মতিভ্রম। অঙ্কুর ঝুলনের সর্বনাশা।

কুঞ্জাটা কি অভিনয়ই না জানে! বন্ধনী-মাকে হার মানিয়ে দিতে চাইছে। সেটি হবে না। এই বন্ধনী-মা সাংঘাতিক। দেখিয়ে দেবে সবাইকে। ওঃ! কি আদুরে কথা—অঙ্কুর! 'মেরা শিশা ইয়ে দিল/হিফাজতে সে রাখ না/ম্যায় আপনা সমঝ কর দিয়ে যা রহা হুঁ'—আমার কাঁচের মতো অন্তর তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি তোমাকে বিশ্বাস করি, অতি আপন ভেবেই দিচ্ছি। নিশ্চয় তুমি খুব যত্নে রাখবে।

কি কান্না! দুজনের হাতে হাতে দিয়েই কান্নায় ভেঙে পড়েছে কুঞ্জা। এক ছুটে ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়েছে বিছানায়।

বন্ধনী-মা চোখ ঘুরিয়ে, জিভ বাব করে ভেঙচি কেটে বলেছে, কে না বুঝতে পারে! পাঁচ বছরের ছেলেও বুঝতে পারে। ন্যাকামি। ন্যাকামি! তোর যদি অঙ্কুরকে বিয়ে করার অত ইচ্ছেই ছিল, করিস নি কেন! একটা নিষ্প্রাণ পাথর মেয়েকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিলি। দরদী সাজবার কি ইচ্ছে!

বিয়ের পর আসা-যাওয়া করেছে ঝুলন অঙ্কুর। দুজনেই বেশ হাসিখুশি। ওদের ওপরে উঠতে দেখলেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধনী-মা।—বন্ধনী-মা কি বোঝে না, এসব লোক দেখান দেঁতো হাসি। ভেতরে কি আর জ্বলছে না! বন্ধনী-মা-র কথা মিথ্যে হওয়ার, জো নেই। তাকে দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে সকলে এখন। বুঝবে বুঝবে। হাড়ে হাড়ে বুঝবে। হাতি গেল রসাতল/মশা বলে কত জল! যত হাসি তত কান্না/বলে গেছে রাম শন্না!

ঝুলন কুঞ্জার ঘরে ঢুকেছে প্রথমে। নিজের গলার হার হাতের চুড়ি খুলে পরিয়ে দিয়েছে।—কুঞ্জা তুই ঐ গানটা আজ আমায় আবার শোনো। বড় ভালো লেগেছে। বড় ভালো লাগে।

'তুমি আমায় ভালোবাস আমি তোমায় ভালোবাসি...'।

কুঞ্জা বলেছে, অঙ্কুর! তুমি ঐ গানটা গেয়ে শোনাও আবার। সজনীকান্ত মতিলালের রেকর্ড হয়েছে।

'ফুলেরই বাসরে ফুলেরই সাজেতে
সাজাতে তোমারে সাজ
প্রভাতের এ ফুলে গেঁথেছি এ মালা
সাঁঝেরি ফুলেতে পুনঃ ভরি ডালা
মনোমত হারে সাজাও তোমারে
পূজিতে বাসনা আজ'

পাশের ঘরে কানে আঙুল দিয়ে খাটে শুয়ে পা ছুঁড়ছে বন্ধনী-মা। দুম দুম দুম।

বিয়ের মাস দুই পরে বেড়াতে এসেছে অঙ্কুর ঝুলন আর কুঞ্জা। কুঞ্জার চোখের ব্যাপারও আছে। দিল্লিতে ডাক্তার দেখিয়ে নেবে।...দিল্লি হয়ে আগ্রা এসেছে তাজমহল দেখতে। এখানেই মিরাজের সঙ্গে পরিচয়। এখানেই হোটেলে নসিবের সঙ্গে। দুটো দিনে দুশো বছরের ঘটনা ঘটে গেছে, ঝুলনকে নিয়ে মিরাজ আর নসিবের পরিচয়ের সুতো ধরে। ঝুলনের কলঙ্কের শেষ নেই। অঙ্কুর ক্ষিপ্ত, উগ্র। ভোররাতে ঝুলন উধাও।

মাঝে মাঝে একটা চিন্তা কি ঝলক বিদ্যুতের মতো কুঞ্জার মাথায় এসে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে।

কুঞ্জা কি ভুল করেছে অঙ্কুরের সঙ্গে ঝুলনের বিয়ে দিয়ে?

বন্ধনী-মা-র দীর্ঘনিশ্বাস কি সত্যিই ফলতে চলেছে?

না। গালে হাত দিয়ে বসে ভাববার সময় নেই। এত অমঙ্গুলে ভাবনা আসত না যদি না অঙ্কুরের আচার-আচরণ জঘন্য না হতো।

কুঞ্জা তো বরাবর চেয়েছে সে দুঃখি হোক, তার মৃত্যু হোক। ঝুলন সুখি হোক, ঝুলন বাঁচুক।

হ্যাঁ, অঙ্কুরকে ভালো লেগেছে। লাগে নি যে তা নয়। নয় বললে নিজের বিবেকের কাছেই সে হীন হয়ে পড়বে।

ঝুলনের জন্যেই তার সুখের জন্যেই তাকে বুক বেঁধে সরে যেতে হয়েছে। ঝুলন যে সেটা একেবারেই বোঝে নি তা নয়, বুঝেছে।

যখন দুজনের হাতে হাতে দিয়ে বিদায় দিয়েছে, চোখের জল ওদের ওপর পড়েছে, তখন ঝুলন কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলেছে, সব্বনাশী! আগে

বলিস নি কেন!

হ্যাঁ, বলে নি। বলে নি। মুখ খোলে নি। ঝুলনের মুখ চেয়ে। ঝুলনের সুখ চেয়ে। কুঞ্জা নিশ্চিত ভেবে নিয়েছে সংসার জীবন তার সুখের হতে পারে না।

দু দুবার দুটো বিষম আঘাত। যদিও দু রকমের। একজনে তাকে ফাঁকি দিতে চায় নি, তাই বোধহয় পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। প্রথম।

দ্বিতীয় তাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে। ফাঁদে ফেলেছে। তাই বেঁচে আছে। কিন্তু কুঞ্জার কাছে তো মরণেরই সমান। পাছে আর একটা আঘাত এসে বুকে চেপে বসে, তাই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে ধীরে ধীরে অঙ্কুরের কাছ থেকে। ঝুলনকে এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একি হলো! ঝুলন কোথায় কে জানে! ভাবতেও শিউরে উঠছে সর্বশরীর কুঞ্জার। আছে?

অঙ্কুর ঝুলনকে নিক না নিক, কোনো দুঃখ নেই। ঝুলন যেন বেঁচে ফিরে আসে।

আবার অনুরোধ করেছে মিরাজের দুটো হাত ধরে, ভাইসাব জরা কৌশিশ কিজিয়ে। নসিবজি আপকা হি দোস্ত হ্যায়!

জরুর জরুর, মত ঘাবড়াইয়ে।

মিরাজ ডেকেছে বয়কে। পীরবাবার মাজারের খাদেমজি আছে কি না জিগ্যেস করেছে।

জি সাব।

বয় এগিয়ে চলেছে। পেছনে মিরাজ। দুপাশে কুঞ্জা আর অঙ্কুর। খানিক চলার পর গাছ-গাছালি ঘেরা একটা ছোটখাট জঙ্গলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নিচের লতাপাতা হাত দিয়ে সরিয়েছে বয়। সরাতেই চোখে পড়েছে পাথরের সিঁড়ি। এক আধটা নয়। ধাপে ধাপে নেমে গেছে নিচে।

ওরা এক এক করে নামছে। নামছে নামছে নামছে।

একতলা সমান নিচে নেমে চলেছে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে।

কুঞ্জা অঙ্কুর যে একেবারে নির্ভয়ে সুড়ঙ্গপথে চলেছে তা নয়। ভয়। দস্তুর মতো ভয়। এর মধ্যে যে কোনো মানুষ হারিয়ে যেতে পারে মুহূর্তে। করার কিছু নেই। বলার কিছু নেই। শোনার কেউ নেই।

তবু যেতে হচ্ছে। যেতে হবে। বেরিয়ে পালাবারও উপায় নেই।

মিরাজকে বয়কে অবিশ্বাস করারও কোনো উপায় নেই।

মাঝে মাঝে দম আটকে যাওয়ার উপক্রম।

চলছে চলছে চলছে।

পাথরে বাঁধান দুপাশের দেয়াল। ঠাণ্ডা-বরফ। খানিক যাওয়ার পর একটা সুন্দর সুবাস নাকের পাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

কিসের?

লোবানের।

কারও মুখে কোনো কথা নেই।

যত এগিয়ে যাচ্ছে ততই গন্ধটা এগিয়ে আসছে।

সুন্দর প্রার্থনা-গান কাওয়ালি শোনা যাচ্ছে। ভারি মিষ্টি সুর। কথা আরও মিষ্টি।

এতক্ষণ মনে হয়েছে কোন রহস্যপুরীতে চলে যাচ্ছে। চিরদিনের অজানায়। এখন মনে হচ্ছে না—প্রাণের সাড়া পাচ্ছে। কি সুন্দর কথা!

খুদা তেরি দুয়া মুঝে আওলাদ বনা দিয়া
দুনিয়া তসবির তেরি মুঝে গুলিস্তাঁ বনা দিয়া
তেরি আঁখে মেরি নজর বনা দিয়া
তেরি জিন্দগি মেরি জিন্দগি বনা দিয়া
তেরি বন্দেগি মুঝে ইনসান বনা দিয়া
খুদা তেরি দুয়া মুঝে আওলাদ বনা দিয়া

খুদা, তোমার আশীর্বাদই আমাকে সৃষ্টি করেছে। দুনিয়া তোমার আঁকা ছবি। সেই ছবির মধ্যে তুমি আমায় ফুলের বাগান করেছ। তোমারই চোখ দিয়ে আমি দেখছি। তোমরাই প্রাণ আমার প্রাণ। তোমাকে বন্দনা করে আমি মানুষ হয়ে উঠি।

মোমের আলো জ্বলছে চারপাশে। মাঝখানে রেশমি চাদর ঢাকা মাজার। ওপরে গোলাপের পাপড়ি ছড়ান।

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে মিরাজ আওয়াজ করতে নিষেধ করেছে।

অবাক হওয়ারই কথা। সব সন্দেহের অবসান।

কালো আলখাল্লা পরা খাদেম বসে আছেন মাঝখানে। বুক অব্দি পাকা দাড়ি। গলায় পাথরের মালা-সবুজ, কালো, শাদা। ঘাড় অব্দি শাদা চুল। বয়েস সত্তর পঁচাত্তর।

পীরবাবার খাদেমের দুপাশে বসে দুজনে। ডাইনে ঝুলন। বাঁয়ে নসিব। দুজনের হাতেই লাল গোলাপের তোড়া। দু চোখ বোজা। ধ্যানতন্ময়। খাদেমেরও চোখ বোজা।

ভর হওয়া মানুষের মতো দুলতে দুলতে বলে চলেছেন খাদেম, নূর পীরবাবার মাজারে এসেছে নসিব। নসিব রোজই ভোরে আসে। নিয়ে আসে ফুলের তোড়া। নসিবের বাগানেই নূর পীববাবার সমাধি।

নসিবের বাবার—আব্বাজানের দৃষ্টি নষ্ট হতে দেন নি নূর পীরবাবা। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, দু হাত নাকের সামনে ধরে নিশ্বেস টানবে 'ইয়া' বলে। নিশ্বেস ছাড়বে 'নূর' বলে। আট দশ বার এরকম করার পরে ঐ হাত দুটোয় আলতোভাবে দু চোখ বন্ধ করে রাখবে কিছুক্ষণ। এই রকম রোজ দুবার বা তিনবার।

আব্বাজান নিষ্ঠা নিয়ে বিশ্বাসে ভর করে নিয়ম পালন করে গেছে প্রতিদিন। দেখা গেছে আশি বছর বয়েসেও দৃষ্টি যেতে যেতে একই জায়গায় থমকে গেছে। সেই থেকে নূর পীরবাবাকে এখানে রেখে দেয় আব্বাজান। এখানেই তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ে।

ঘর থেকে বেরবার সময় দুজনের মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়—ঝুলন আর নসিবের। নসিব ঝুলনকে নূর পীরবাবার কথা জানায়।

কুঞ্জার চোখের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে ঝুলন। সঙ্গে আসতে চায়।

যার যেমন মন সে তেমন ভাবে। ঝুলনকে দেখে নসিবের মনে হয়েছে অনজান। অনজান ওদের পুরনো দিনের বন্ধু। বেশ জোর দিয়ে খাদেম সাহেব—পীরবাবার সেবক বলেছেন, আমি বলছি অনজান ঝুলন নয়। ভুল ধারণা।

হ্যাঁ, আমিও লক্ষ্য করেছি ধরন-ধারণ চলন-বলন এমন কি চেহারা চাউনিটি পর্যন্ত হুবহু অনজানের। তা বলে সেই অনজান আজ ঝুলন হয়ে এসেছে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রম।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, মানুষ চলে যাওয়ার পরে সেইরূপ নিয়ে আর জন্মায় না।

তিনজনে হতবাক। হতভম্ব। মিরাজের কিন্তু ঝুলনকে বারবারই অনজান মনে হয়েছে। হয়েছে কেন, এখনও হচ্ছে। খাদেম সাহেব যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই ভুল। তবুও মনকে নিজের ধারণা থেকে সরাতে পারছে না।

খাদেম সাহেব বলছেন, সবচেয়ে যে প্রিয়, মন থেকে তাকে মানুষ সরাতে পারে না কোনো দিনই। সত্যিকারের মহব্বত এটা। সত্যিকারের ইনসানদের এটা হয়। বেইমানরাই ভুলে যায়। মনে রাখাটা দোষের নয়। শুধু একজনকে অন্য জনের মধ্যে ভাবা মস্ত ভুল।

এরপর অন্য কথায় এসেছেন খাদেম সাহেব।

শোনা যায়, খাদেম সাহেব অন্যের কথা না জিগ্যেস করেও নিজের মনে শোনেন। দ্বিধা সংকট দূর করে দেন স্পষ্ট উত্তর দিয়ে।

বলছেন, নসিব আর হাবিব দুভাই। আব্বাজান নসিবকেই ভালোবেসেছেন। বেশি পছন্দ করেছেন। হাবিব বড় হয়েও এটা সহ্য করতে পারে নি। রাগে ফেটে পড়েছে।

আব্বাজানের সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি নসিবকে।

পীরবাবা আশ্বাস দিয়েছেন নসিবকে—দেখা হবেই। কারও সাধ্যি নেই আটকায়।

রোজ একই সময়ে একই চিন্তা করতে হবে দু জনকে।

আব্বাজানের ঘরের দেয়ালে নসিবের ছবি টাঙানো থাকবে।

বাবার দেখার ইচ্ছেটা ঐ ছবিটাকেই নিয়ে। ছবিটার চিন্তা।

ছবি যেন ছবি নয়। সাক্ষাৎ নসিব।

নসিবের চিন্তায় আব্বাজান এক দৃষ্টে তাকিয়ে তার দিকে।

আব্বাজান তাকিয়ে থাকার সময় নসিবের ভেতরে একটা প্রবল ইচ্ছে জেগে উঠবে দেখা করার জন্যে। সম্মোহিত মানুষের মতো ও চলে যাবে আব্বাজানের ঘরে। আব্বাজানের কাছে। কেই জানতে পারবে না। সকলেই আচ্ছন্ন। কেউ জানতে পারবে না।

সেই সময় ঘরে যদি কেউ থাকে, সে একটা আচ্ছন্ন আবশে ঘুমিয়ে পড়ে।

এইভাবেই আব্বাজানের সঙ্গে নসিবের রোজ দেখা হয়েছে রাতে। সকলের চোখ এড়িয়ে।

যে ঘরে ঝুলনরা রয়েছে। সেই ঘরেই নসিবের আব্বাজান থেকেছে। নসিবের ছবিটা এখনও দেয়ালে। আজ আব্বাজান নেই, কিন্তু আগেকার নিত্য অভ্যেস আজও রয়ে গেছে নসিবের। যে যে সময় ছবিটার সামনে দাঁড়িয়েছে ঝুলন, সেই সময়টা ও কেমন যেন এক হয়ে গেছে।

নসিব উঠে এসেছে ঝুলনদের ঘরে।

মাজারে লাল গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে মিরাজ কুঞ্জা ঝুলন নসিব অঙ্কুর।

খাদেমসাহেব প্রসাদী গোলাপ জল ছিটিয়ে দিয়েছেন ওদের প্রত্যেকের গায়ে মাথায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে কুঞ্জা।

আস্তে আস্তে ওরা সবাই ওপরে উঠে এসেছে।

বিশ্বাসের অভয় হাসি মিরাজের মুখে চোখে। খানদানি সম্ভ্রমের ছাপ ফুটে উঠেছে নসিবের চোখে মুখে।

অঙ্কুরের?

গোলকধাঁধায় পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে যেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলনায় দোল খেতে খেতে দোলনটা অবিশ্বাসের দেয়ালে গিয়েই বারে বারে ঠেকছে। এসব মিথ্যে মিথ্যে। বানানো গল্প।

মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে কুঞ্জা। বিরক্তির এক শেষ।

মিরাজ ঝুলনের দিকে একবার করে তাকাচ্ছে। একটা নিশ্বাস ঝরে পড়ছে। আবার আকাশে দু চোখ মেলে ধরেছে।



অনজান।

হ্যাঁ, নিছক সত্যি কথা এটা। অনজানের জন্যে আজও এই মুহূর্তেও মিরাজ বেঁচে আছে। অনজান মিরাজকে মরণের মুখ থেকে টেনে ফিরিয়ে আমার জন্যে মরণ গহ্বরে এগিয়ে গেছে।

কি দুঃসাহস!

কত রাত ঘুমোয় নি। চোখে পাতায় এক করতে পারে নি।

'তমান্না-তমান্না' করে পাগলের মতো ঘর থেকে বেরতে চেষ্টা করেছে। ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছে। এ শরীর না গেলে তার কাছে বোধহয় পৌঁছন যাবে না।

নিজের লাল ওড়না দিয়ে মিরাজের চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে অনজান।

কি কঠিন মনের মেয়েরে বাবা! হাসি কান্না নাকি সংক্রামক। হাসি দেখলে ছড়িয়ে পড়ে অন্য মুখে। কান্না দেখলে ছড়িয়ে পড়ে অন্য চোখে।

মিরাজের হাসি দেখে অনজানের মুখে ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে হাসি। কিন্তু কান্না! কোথায় কান্না! এক ফোঁটা নেই। মরুভূমি। মরুভূমি।

অনজান কোথাকার মেয়ে সে নিজেই বলতে পারে নি।

তুমি কি মরুভূমির দেশের?

হতে পারে।

শুনেছে গান-নাচ শিখেছে যার কাছে সে নিজের মা নয়। কারা নাকি খুব ছোটবেলায় ধরে এনে এই পাতান-মায়ের হাতে তুলে দিয়েছে।

টাকার জন্যে না কোনো গোপন উদ্দেশ্যে—সে কথা পাতান-মা কোনো সুযোগেই প্রকাশ করে নি।

মৃত্যুর সময় আনজান প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে।

খুশি হয়ে খুব আশীর্বাদ করেছে—খুদার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছে অনজানের জন্যে। বলেছে, অনজান, সবার মনে তুই বেঁচে থাকবি। তুই কোনোদিন মরবি না।

তোর গান আর প্রাণ প্রতি জনের মনে-প্রাণে বেঁচে থাকবে।

বেঁচে আছে। বেঁচে আছে। বেঁচে আছে।

তমান্না কোথায় কে জানে! কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

খুঁজে খুঁজে হয়রান। মিরাজের সন্দেহ, বেঁচে আছে কি!

অনজানের উত্তর, মৃদু হেসে বলেছে, আছে বৈ কি! নিশ্চয় একদিন না একদিন তোমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে তোমার সামনে এসে হাজির হবে।

মিরাজের উদাস দৃষ্টি।

তমান্না কপালে হাতে ঠেকিয়ে বলেছে, তকদির। তকদির। এজন্মে আর বুঝি দেখা হবে না। তমান্না আসতে আসতে মিরাজ হয়ত পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে।

মিরাজের মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছে অনজান, সে দৃশ্য যেন আমাকে দেখতে না হয়। তার আগেই যেন আমি চলে যাই।

অনজানের দু কাঁধে দু হাত রেখে ধরা গলায় করুণ স্বরে মিরাজ বলেছে, অনজান, একথা মুখে আর কোনোদিন এনো না। বাঁচতে হয় দুজনে এক সঙ্গে বাঁচব। মরতে হয় দুজনে একসঙ্গে মরব। ওয়াদা কর—প্রতিশ্রুতি দাও।

খানিক চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলেছে অনজান, যেন কত দূর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে—প্রথমটায় রাজি আমি। এক সঙ্গে মরণ। সে মরণ সুখের। সে মরণ বেহস্তে গমন। স্বর্গে পৌঁছে যাওয়া। তোমাকে কথা দিতে হবে তোমার মধ্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। আগে মরলে তুমি মরতে পারবে না। কিছুতেই নয়। প্রতিজ্ঞা কর।

মিরাজের দু হাত ধরে কাঁদছে অনজান।

মিরাজের চোখে জল।—তোমায় চলে যেতে দেব না। সময় সময় মনে হয় তোমাকে দেখে তমান্না বুঝি কাছে বসে রয়েছে।

তমান্না নয়। তমান্নার বন্ধু ভেবে।

চোখে ওড়না ঢাকা দিয়ে পেছন ফিরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছে অনজান। পাছে মিরাজ ভেঙে পড়ে।

তমান্না তোমাকে ভালোবেসেছে। আমি প্রতিশ্রুতির বাঁধনে বাঁধা। তার ছায়া হয়ে তোমাকে বাঁচাব। সে জীবন দিয়েও।

তমান্না অদৃশ্য নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে পর্যন্ত পাখি পড়ানর মতো প্রতিশ্রুতির কথা যতটা পেরেছে ততটা কানে ঢুকিয়েছে, মনের পর্দায় এঁকে দিয়ে গেছে।

তমান্না কায়া। আমি তার ছায়া।

অনজানের কান্নার জোয়ারে মিরাজের প্রতিশ্রুতির কথা ভেসে হারিয়ে গেছে।

অনজানের সুরমা টানা সজল চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ফেলেছে, তুমি আমার জিন্দেগি। তোমার প্রাণ আমার প্রাণেই বেঁচে থাকবে।

আচ্ছা তমান্না, মাঝে মাঝে বলেছে না মহব্বত কি জিন্দগি তেরে ইয়াদোঁ মে।

হ্যাঁ, তমান্না এ গান বড় ভালোবেসেছে। বার বার প্রত্যেকের কাছে গেয়ে শুনিয়েছে।

মেয়েটার পা থেকে মাথা অব্দি সবই ভালোবাসার ধাতুতে গড়া।

কথা শেষ হতে না হতেই মিরাজ চিৎকার করে দৌড়ে গেছে বারান্দার দিকে—তমান্না তমান্না তমান্না।

পড়িমরি করে অনজানও গেছে। দুজনে সামনা সামনি।

এই তোমার কথা দেয়া! ফের যদি এরকম দেখি তমান্নার মতো আমাকেও খুঁজে পাবে না আর মিরাজ। শাসনের ভঙ্গিতে আঙুল নেড়ে বলেছে অনজান।

এ কি বললে তুমি! থপাস করে বসে পড়েছে। মাথা ভর্তি চুল দু হাতের মুঠোয় ধরে টানছে।—না না না। আর কোনো দিন এরকম করব না। তুমি যেও না।

সময় বুঝে ব্যবস্থা।

মিরাজের হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে এসেছে।

অনজান তমান্না দুটো দেহে দুটো রূপের খনি। কিন্তু মন-প্রাণ একদম একে। আচার ব্যবহার, এমন কি গানের গলাটা পর্যন্ত।

অনেকে আশ্চর্য হয়ে যায়। কেমন করে!

অনেকে আবার আকাশে আঙুল তুলে বলে, ওপরের ইচ্ছেয় সবই সম্ভব।

ফাঁকা পেলেই, মিরাজ যখন কাছে থাকে না, তখন বলেছে, সুযোগ হারায় নি তমান্নার। অনজানরে, কেন মরতে মুজরা করতে এসেছি দিল্লিতে। অন্যের নজরে পড়লে এ আপসোস বাসা বাঁধত না ভেতরে।

আমি যেখানকারই মেয়ে হই, আমি যা হই, আমার ভেতরে একটা ইনসান কাজ করে চলে হরবখত। আমার বিচারক সে। আমার দোষ অন্যায় ধরিয়ে দেয়ার মালিক সে। আমি অপরাধী।

শুধু অপরাধী নয়, খুনী বললেও কম করে বলা হবে। একটা সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে।

কার জন্যে?

তমান্নার জন্যে কি নয়?

অনজান জোর গলায় বলেছে, না। কিসের দোষী! মিরাজকে অনেক বোঝান হয়েছে। অনেক ফেরান হয়েছে। শুনেও সে শোনে নি। দোষটা কার? মিরাজের না তমান্নার?

তমান্না বলেছে, মিরাজের দোষ আমি দিতে পারব না কিছুতেই। আমার প্রকৃতির মধ্যে সকলের সঙ্গে সকলের মিল করিয়ে দেয়ার একটা সুন্দর সেতু আছে। করিয়েও দিয়েছি অনেককে। রূপের মোহে হোক গানের মোহে হোক ব্যবহারের মোহে হোক—ভালোবেসেছে অনেকেই। সে দেখানই হোক আর সত্যিকারেরই হোক। কারও সংসার ভাঙতে দিইনি কখনও। একে একে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে সরিয়ে দিয়েছে তমান্না। হার মেনেছে শুধু মিরাজের বেলায়। নাছোড়বান্দা পুরুষ।

হোক নাছোড়বান্দা।

মিরাজের ভালোবাসায় এক বিন্দু খাদ নেই।

খাদ থাক না থাক সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা বেগমসাহেবার জীবন নিয়ে।

মিরাজের বিয়েতে মুজরো করতে এসেই কাল হয়েছে তমান্নার। এসেছে দিল্লিতে, আগ্রা থেকে। তমান্না আর অনজান শুধু আসে নি। আরও দু-তিনজন রয়েছে।

মিলন-আসরের দৃশ্য চোখের সামনে এক এক করে ভেসে আসে।

তমান্না বলে, ফিরে যাও ফিরে যাও। আমার কাছে এস না তোমরা। আমাকে হৃদয়হীন হতে দাও। আমাকে নিষ্ঠুর হতে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের করুণ কান্না শুনতে পায় অমনি তমান্না।

কে! কে! কার! কার!

বিবেকের। বিবেকের।

বিবেক বলেছে, লজ্জা লজ্জা লজ্জা। কোথায় নেমেছ তুমি! যে গরবে গরবিনী ছিলে এক কালে, সে গরব আজ ধূলিসাৎ। সব পরিবারের বেগমরা তোমায় শ্রদ্ধা জানিয়েছে, মাথায় করে রেখেছে, সে সম্মান ধুলোতে বালিতে মিশিয়ে দিয়ে এগোতে চাইছ আজ! ছি ছি ছি! নির্দয় নিষ্ঠুর।

কে ভাবছে কে বলছে একথা! নিশ্চয় তুমি নও। দুষ্টু ভূত তোমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। নিজেকে সামলাও। সামলাও।

কি যন্ত্রণা। কি আঘাত। তমান্না ছটফট করেছে সারা রাত।—আমি কে! আমি কি করতে এসেছি। ভেতর থেকে উত্তর এসেছে, তোমার ভেতর শয়তান আছে, বেইমান আছে, ইনসান আছে—তুমি মনকে ইনসান করে তোল, যা তোমার মধ্যে রয়েছে। বেইমান হয়ো না। শয়তান হয়ো না।

একা ঘরে ঘন ঘন পায়চারি করেছে তমান্না। দেয়ালে ঘুষি মেরেছে। কপাল

ঠুকেছে। তমান্না ক্লান্ত।

লাল কার্পেটের ওপরে বসে পড়েছে। আয়না দিয়ে নিজের চোখমুখ দেখছে। কি কুৎসিত দেখাচ্ছে! কার মুখে শোনা গানটা না! হ্যাঁ, একটা শোনা গানই ভেসে আসছে। গুরুজির কাছে শিখতে গিয়ে শুনেছে গুরুভাইয়ের মুখে। বার বার মনে আসছে। কানের পাশে এসে গুনগুন করে গাইছে যেন।

য্যায়সা দিল মে সোচ লো
অ্যায়সা স্বরূপ দেখ লো
দিল মে তুমহারে বেইমান হ্যায়
দিল মে তুমহারে শয়তান হ্যায়
আপনে দিল কো সমহাললো
দিল মে তুমহারে ইনসান হ্যায়
আপনে দিল কো বনা লো

হ্যাঁ, বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাতে ঘুষি পাকিয়ে মেরে নিজেই বলে উঠেছে একটু চিৎকার করে নিজেকে শোনানর জন্যে—

দিল মে তুমহারে ইনসান হ্যায়
আপনা দিল কো বনা লো

...বিয়ের আসরে প্রথম অনজানই গেয়েছে। নাচে গানে সব দিকেই ও সবার চেয়ে অনেক উঁচুতে। যা ভাবা গেছে তাই হয়েছে। ওর পরে যে আর কারও গান জমবে না, এটা জানা। পর পর—তিন জনে ভালো গাইলেও তেমন জমে নি।

কি যে হলো খোদাই জানে।

তমান্না গান গাইতে চায় নি। জোর করে গাওয়ান হয়েছে। তাও দুলহা আর দুলহিনের অনুরোধে—মিরাজ আর মিরাজের বেগমের।

খুব ভয়ে ভয়েই গেয়েছে তামান্না।

মহব্বতকে বুলবুল দিল বাগিচা মে
মহব্বতকে তরিজ তেরে আওয়াজোঁ মে
মহব্বতকে জিন্দগি তেরে ইয়াদোঁ মে

মিরাজ আর বেগমসাহেবা হাততালি দিয়ে উঠেছে আনন্দে।—বাহ্! বহুত খুব।

এই একটাই গান আর গায় নি। এই একটাতেই মাত করে দিয়েছে।

আনন্দে আত্মহারা মিরাজ। বেগমও খুব হাসিখুশি। গাইয়ে-বাজিয়েদের সকলকেই এক একটা মুক্তোর আংটি উপহার দিয়েছে মিরাজ।

সেলাম জানিয়ে বিদায় নিয়েছে।

ঘরের কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তমান্না। নীল ওড়না, গোলাপি জ্যাকেট হলুদ কুর্তা, হলুদ গারারা।

সুন্দরী তমান্না অপরূপা।

ওর লাজুক লাজুক ভাবটা সবার থেকে তফাৎ বলে নজর টানে।

নজর টেনেছে দুজনের—মিরাজ আর বেগমসাহেবার। হাত নেড়ে দুজনেই ডেকেছে—আইয়ে আইয়ে।

মিরাজ বলে উঠেছে, আপ হি দিল কি বুলবুল।

বেগমসাহেবা আড়চোখে মিরাজের দিকে তাকিয়েছে।

হাসতে হাসতে ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে দিয়েছে মিরাজ—মহব্বতকে জিন্দগি তেরি ইয়াদোঁ মে। আইয়ে আইয়ে। কেয়া সোচ রহি হ্যায়!

এগিয়ে এসেছে তমান্না। দুজনকে সেলাম জানিয়ে হাসতে হাসতে বলেছে, দোয়া মাঙছি। খোদা আপনাদের খুশি করুন।

এরকম কথা কেউ বলে নি। এ যে প্রাণের কথা। আপনজনের কথা। মঙ্গল কামনার কথা। মিরাজের মনে হয়েছে অদ্ভুত। এ এক নতুন জগতের মানুষ তমান্না। এর আগে অবধি কেউ এমন কথা বলে নি।

নিজের গলার মুক্তোর মালা খুলে তমান্নার হাতে দিয়েছে।

তমান্না মালা কপালে ঠেকিয়েছে। এবারেও বেগমসাহেবা আড়চোখে তাকিয়েছে। মিরাজের দিকে একবার। তমন্নার দিকে একবার।



মেয়েরা নাকি মানুষের মন বুঝতে নিপুণ। ঝড় উঠবার আগে যদি সাবধান হওয়া যায় হয়তো মারাত্মক বিপদ থেকে বাঁচা যেতে পারে।

সমানে সমানেই শাদি হয়েছে মিরাজ আর বেগমসাহেবার। মিরাজ যেমন খানদানি ঘরের তেমনি বেগমসাহেবাও। চুপি চুপি বাঁদি পাঠিয়ে দিয়েছে তমান্নার কাছে। বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে আসতে বলেছে। মুখসুদ্ধু। কালো রঙের বোরখা।

বাঁদি মালকিনের আদেশ শিরোধার্য করেছে। গোপন পথে গোপনে নিয়ে এসেছে তমান্নাকে।

আলাদা ঘরে জানলা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেগমসাহেবা চুপি চুপি বলেছে তমান্নাকে. বহিন, একমাত্র তুমি-ই শান্তি দিতে পার। আমি জানি এসব পরিবারের ছেলেদের বেলায় কোনো দোষ নেই। বেগম অনেকই থাকতে পারে। বাপ-দাদাদেরও দেখেছি। তোমাকে বলছি, তুমি অন্য মেয়েদের মতো নয় বলে। আমার প্রথম জীবন যাতে সুখে যায়, সেটা একমাত্র তুমিই করতে পার। আসরেতে সাহেবের চোখে আমার মরণ-ছায়া দেখেছি।

শিউরে উঠেছে তমান্না।—এ কি বলছেন সাহেবা!

হ্যাঁ, একটু দেরিতে হলে গা-সওয়া হয়ে যেত। জানতুম সব ঘরের বেগমদেরই তো একই অবস্থা। কিন্তু প্রথম দিনেই সুখের আসরে মন বদলের পালা ঘটে গেল সাহেবের। সেটা আর কারও নয়, তোমার সঙ্গে।

তমান্না অবাক।

আমার!

উত্তেজনায় গলা কেঁপে উঠেছে বেগমসাহেবার।

হ্যাঁ, তোমার তোমার তোমার। বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছে।

তোমরা অনেক ছলা-কলায় মোহিত করে দিতে পার মুহূর্তে। আমি জানি না তোমাদের কায়দা-কানুন। আমাকে শিখিয়ে দাও। না হয় সাহেবের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নাও। মন সরিয়ে নাও।

আদেশ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই অনুরোধ করে ফেলেছে বেগমসাহেবা। তমান্নার দুহাত ধরে বলেছে, বহিন, আমার কথা নিশ্চয় তুমি রাখবে। রাখবে না? ছলছলে চোখে তাকিয়ে আছে মুখের দিকে।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

তমান্না কি করবে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বুঝতে পেরেছে সাহেবাকে প্রতিশ্রুতি না দিলে তার মুক্তি নেই।

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। ওঠানামা করছে বুক। দ্রুত দ্রুত।

পর্দা ঘেরা ঘরে বসে পর্দার পেছনে কারা যেন সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলাফেরা করছে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে তমান্না।

ফিস ফিস আওয়াজেরও শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তমান্নার দৃষ্টি ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে এসে থমকেছে। না, পালাবার পথ নেই। মৃত্যু ফাঁদে পা দিয়েছে সে।

ওর চোখের দৃষ্টি বেগমসাহেবা লক্ষ্য করেছে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে একটা টুসকির আওয়াজ তুলেছে বেগম।

পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে দুজন মহিলা—পুরুষের বেশ। হাতে ছোরা।

গোল করে ঘিরে ধরেছে তমান্নাকে। প্রত্যেকে ছোরা উঁচিয়ে ধরেছে।

এক পলকের ব্যাপার। তারপর সব শেষ।

বেগমসাহেবাকে কোনো দুঃখ দিতই না তমান্না। এখানে এখনও প্রতিজ্ঞা না করলেও আগে থেকে মনে মনেই সে করে রেখেছে। একটু তর সইল না। বলেছে তমান্না—যদি আমার ওপর বিশ্বাস না হয় তাহলে এ কণ্টককে আপনি তুলে ফেলতে পারেন। সকলের ওপর থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

তমান্না গেলেও অন্য আরও যে অনেক 'ন্না' আসবে না কে বলতে পারে। তার চেয়ে বরং মিরাজসাহেবরাই মন ঘোরান বিশেষ প্রয়োজন। যদি ঘোরান যায়, সারা জীবন সুখি হবে।

আমি আপনার জীবনে চলার পথে কোনো দিন কাঁটা হয়ে উঠব না জানি। মনে রাখবেন ভয় পেয়ে বলছি না। ওপরঅলার কথা ভেবেই শপথ নিয়ে বলছি। খোদার কাছে আর্জি আমার—খোদা দোয়া কর।

বেগমসাহেবার চোখের ইশারায় যারা এসেছে তার সরে গেছে চোখের পলকে।

ফিরে এসে মুষড়ে পড়েছে তমান্না। মর্মাহত। আশা করে নি বেগমসাহেবার এমন ব্যবহার। প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই দিত তমান্না। এত জোর করে ভয় দেখিয়ে করানটা তমান্নার মন মেনে নিতে পারছে না।

এরকম যার বেগম তার জীবনে সুখের সূর্য অস্ত। উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঘে মেঘে ঢাকা পড়ে যাবে। মেঘ মেঘ। কালো কুচকুচে মেঘ।

দিল্লিতে যত দিন থেকেছে, ততদিন বেগমের শাসানির ওপর। রোজ লোক পাঠান আর ভয় দেখান। বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করছে তমান্না।

প্রতিদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষাকষি করে যারা বেঁচে থাকে, যাদের জীবন এইভাবে চলে আসছে, তাদের বিষধর আর ঢোঁড়ায় তফাৎ কি? মরতে হবেই তো একদিন। শেষ পর্যন্ত সকলের জীবনে মওত আসবে একদিন। সে নগণ্য জঘন্য বাইজিদের বেলাতেও যা, আর গণ্যমান্যধন্য বেগমসাহেবাদের বেলায়ও তাই।

সকলকেই যেতে হবে এই দুনিয়ার মাটির তলায়।

নিজের মনেই হেসে উঠেছে। মানুষ কি মনে ভাবে। কত অবুঝ। সবাই চলে যাবে। সে বুঝি একাই বেঁচে থাকবে। পৃথিবীর যত রকমের সুখ ভোগ করার জন্যে।

দুঃখ হচ্ছে মিরাজসাহেবের জন্যে। বেচারা!

আয়নার দিকে তাকাতে নজরে পড়েছে মিরাজসাহেবকে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। চমকে উঠেছে তমান্না।

এসে বলেছে মিরাজ, ভয় নেই। দুষ্টু পাজি নই আমি। এসেছি গান শুনতে। তোমার সেই গান। 'মহব্বতকে বুলবুল দিলকে বাগিচা মে...'। আহা! কি কথা! 'মহব্বতকে জিন্দগি তেরে ইয়াদোঁ মে'। পাশে গিয়ে বসে পড়েছে মিরাজ।

কার লেখা কার সুর?

মাথা নিচু করে তমান্না বলেছে, এই গরীবেরই লেখা আর গরীবেরই সুর।

গানে মুগ্ধ মিরাজ প্রতিদিনই আসতে শুরু করে দিয়েছে।

তমান্না গান শুনিয়েছে। ভালো ব্যবহারে মনোরঞ্জনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, কোনো ফাঁক-ফাঁকি থাকে নি। মাঝে মাঝে মনের অবস্থা জেনে বুঝিয়ে চলেছে, আমরা যত ভালোই হই না কেন, তবু সমাজ ঠিক ঠিক সুনজরে দেখে না। অনেকে ভালো বললেও 'খারাপ' কথাটা ঘোচে না। থেকেই যায়। নদীর পাড় ভাঙা জায়গার মতো।

চতুর্দিকের সকলে জেনে গেছে মিরাজ আসা-যাওয়া করে। নিশ্চয় বাড়ির কানেও গেছে। সাহেবের এ বদনামে তমান্না খুব যন্ত্রণা পায়।

মিরাজ কথা দিয়েছে শাদি করলে তার বদনাম হবে না।

পাশের ঘরে অনজান এসে বলেছে, মুখে বলা যত সহজ কাজে করা তত শক্ত হুজুর। উমরাও জানকে শাহজাদা শাদি করেছে কি? এ কথা তো সবাই জানে।

মিরাজের সম্মানে কুড়ুলের ঘা পড়েছে। চটে উঠেছে। উমরাও জানের শাহজাদা আর এ শাহজাদায় অনেক ফারাক অনজান। অনেক ফারাক। আশমান-জমিন।

আচ্ছা, দেখা যাবে।

গুম হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে মিরাজ।

আর্তস্বরে বলেছে তমান্না, এ কি করলি রে অনজান! এ কি বললি রে! জিদটাকে বাড়িয়ে দিলি! এখন উপায়!

উপায় আবার কি! নিরুপায়। যাদের লোকের ভরসা তাদের উপায় নিরুপায় দুই-ই সমান। দুদিকের পাল্লাই ভারি। অনেক দেখা গেছে।

তোকে শাদি করবে! বিদ্রূপ করে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে বলেছে অনজান, জিদ বাড়ুক। ভালো তো। বিয়েতে লুচি-মণ্ডা খাব।

সকাল যে সন্ধ্যে নয় তা পরিষ্কার হয়ে গেছে তমান্না অনজানের চোখে। মৌলবী সঙ্গে করে তৈরি হয়ে এসেছে মিরাজ। প্রতিশ্রুতি দেয়ার কথা না বললেও তমান্না পাকে-প্রকারে জানিয়েছে মিরাজকে, বেগমসাহেবা সুখি হতে না পারলে সে সুখি হতে পারবে না। সে নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে।

অনুরোধ, উপরোধ প্রতিজ্ঞার কথা—সব ভেসে গেছে স্রোতে পড়া কুটোর মতো। মিরাজের সাচ্চা মহব্বতের জয় দিয়েছে অনজান।

এ বিয়ের কথা গোপন থাকে নি। খানদানের মান-সম্ভ্রম ঘুচিয়েছে মিরাজ। বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। তমান্নাকে না ছাড়লে কেউ মুখ দর্শন করবে না তার। ফতোয়া জারি যাকে বলে।

তমান্নাকে তালাক দিয়ে ফিরে যেতে বলেও কোনো ফল ফলে নি। দিল্লি ছেড়ে আগ্রায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তমান্না।

ধীরে ধীরে নিজেই মিরাজের কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। পাপবোধ। ভীষণ পাপবোধ। কথা দিয়েছে। প্রতিশ্রিুতি দিয়েছে বেগমসাহেবাকে। কিছুই থাকে নি। বেগমসাহেবা অসুখি।

মনে মনে অখুশি তমান্নাও।

যতদিন যাচ্ছে সামনে থেকেও আড়াল হয়ে পড়ছে তমান্না।



দুর্ঘটনাকে ডেকে আনতে হয় না অনেক সময়। এর জন্যে প্রস্তুতিপর্ব লাগে না। তবু সে আসে। কাজ সমাধা করার জন্যে। সমাধা হোক না হোক, তছনছ লণ্ডভণ্ড। হানাহানির চিহ্ন রেখে সে চলে যাবে দুঃসাহসীর মতো মাটিতে পা ফেলে ফেলে। বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে। এতবড় বাহাদুর আর হয় না। দুনিয়া জয় করে ফিরেছে যেন।

এখানে স্বতন্ত্র ধরনের। দুনিয়া জয় করে ফিরতে হয় নি কাউকে। ফিরতে দেয় নি মিরাজ। বেগমসাহেবা ক্রোধে ফেটে পড়েছে। বুকে মাথায় আগুন জ্বলছে দিন-রাত্তির। এর শেষ করতে হবেই, যে কোনো উপায়ে হোক। তমান্নাকে যদি পৃথিবী থেকে সরাতে হয়, তাও করবে বেগমসাহেবা। অন্য বেগমদের মতো চুপ করে থাকার পাত্রী নয় এ বেগম।

মিরাজকে কাছে পেয়েও যখন হারাতে হয়েছে, তখন অন্য কাউকে পেতে দেবে না সে এ জীবন থাকতে।

চতুর্দিকে চর আর চর। বেগমসাহেবার চর ছড়িয়ে পড়েছে। বেগমসাহেবা অতটা বোঝে নি। চরেরাই অনিষ্ট করে বসে শেষে। বেগমসাহেবার অজান্তে চরেদের ভেতরের লোকই মিরাজকে জানিয়ে দিয়েছে সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা।

ঝোপ বুঝে কোপ মারবার চেষ্টা বেগমসাহেবার। সময় সুবিধে সদ্ব্যবহার করতে হবে। তমান্নাকে তুলে নিয়ে এসে একদম বেপাত্তা।

শোনার পর থেকে পায়ের রক্ত মাথায় উঠেছে মিরাজের। চুপ করে বসে থাকার পাত্র নয়। যতরকম সম্ভব ততরকম ব্যবস্থা নিয়েছে।

এ ব্যবস্থা এমন—লড়েঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

আগে থেকে জানতে পেরেই অনজান তমান্নাকে সরিয়ে রেখেছে।

তমান্নাকে না পেয়ে অনজানকে নিয়ে যেতে গিয়ে যত বিপত্তি। বেগমসাহেবার চরেদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি কাটাকাটি।

মিরাজের দলের শক্তির কাছে বেগমসাহেবার দলের পরাজয়। বেগমসাহেবার আরও চতুর্গুণ প্রতিশোধস্পৃহা বেড়ে উঠেছে।

জিদে ঘা পড়লে শান্ত না হয়ে অনেক সময় শতগুণ জিদ বেড়ে ওঠে। সে অন্যায় ন্যায় লক্ষ্য করে না। লঘু-গুরু মানতে চায় না। জেদাজেদিতে কে জিতবে, সেই অপেক্ষা।

তমান্না আড়ালে থেকেও সমস্ত জিনিসটা নিখুঁত নির্ভুল ভাবে বুঝে নিয়েছে। জেদাজেদিকে আর এক দমই এগোতে দেয়া উচিত হবে না। তমান্নাকে নিয়ে যত ঘটনা-দুর্ঘটনা।

তমান্নাকে যদি কোনো পক্ষই না পায়, তাহলে সব ঝামেলাই চুকেবুকে যায়। তমান্না শান্তি চায়। বেগমের ঘর ভাঙতে চায় না। বেগমের কাছ্ থেকে মিরাজকে কেড়ে নিতেও চায় না। বেগম ভুল বুঝে অনাসৃষ্টি করে বসেছে।

মিরাজ দুনিয়া থেকে হারিয়ে যায় এটা চাইবে না তমান্না। চাইবে নাও কখনও। বেগমসাহেবা বুকে ব্যথা পুষে চোখের জল ফেলে দিন কাটাবে, সেটাও না। তমান্নাকে নিয়ে অনজান ব্যতিব্যস্ত। কোথায় রাখে কোথায় না রাখে। বিপত্তি আর বিপত্তি। বিপত্তি থেকে একমাত্র মুক্তির পথ তমান্নার সরে যাওয়া। এ ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। অন্ধকার। অন্ধকার। আচমকা এক টুকরো আলো দেখেছে বুঝি। সঙ্গীত সম্রাট আবদুল করিম খাঁর কথা মনে পড়ছে। সাহারানপুর জেলার কিরানা গাঁও আর কিরানা ঘরানাকে যিনি আলোর জগতে এনেছেন। করিম সাহেবের দ্বিতীয়া স্ত্রী তারাবাঈ যখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ওঁকে ছেড়ে চলে যায়, তখন মনের দুঃখে করিম সাহেব আংটির হিরেটা গিলে ফেলেছিলেন। হিরে জহর, খেলে মৃত্যু হবে। হয় নি। বেঁচে থেকেছে আরও তাঁর অমৃতলোকের অমৃতকণ্ঠ। তমান্না হিরে গিলে হাস্যাস্পদ হতে চায় না আর। করিমসাহেবের মতো মৃত্যু চেয়েছে। পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ করিম খাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গান শুনবেন।

ট্রেনে করে আসছেন আবদুল করিম খাঁ। হঠাৎ মাদ্রাজে সিঙ্গাপেরুমল কোইল রোড স্টেশনে এসেই বলে উঠেছেন, মেরা আখরি বখত আ গ্যয়া। দড়ি বিছাও।

প্ল্যাটফর্মে শতরঞ্চি বিছানো। করিম খাঁ তানপুরা নিয়ে বসেছেন। তান ধরেছেন।

খুশির মেজাজে দরবারি কানাড়া গাইতেন তিনি। গেয়েছেন।

গাইতে গাইতেই সুরের রাজ্যে সুরের মানুষের প্রাণ মিশে গেছে।

তমান্না প্রার্থনা করেছে, ওস্তাদজি আমাকে মৃত্যু দাও। তোমার মতো মৃত্যু দাও। পাগলের মতো গান গেয়ে চলেছে। মৃত্যু আসে নি। গোপনে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই চোখের সামনে।

সব কথা চেপে রেখে অনজানকে কেবল বুঝিয়েছে মিরাজের দিকে লক্ষ্য রাখতে। মিরাজের শরীর মন কোনোরকমে অসুস্থ হয়ে না পড়ে। তমান্নার ছায়া হয়ে

দাঁড়ায় যেন অনজান। অনজান যেখানেই যাক—।

অনজান যেখানেই যাক বলে একটু থেমে গেছে তমান্না। সঙ্গে সঙ্গে সোফা থেকে উঠে গিয়ে কৌচে বসা তমান্নাকে জড়িয়ে ধরেছে বুকে।

অনজানের বুকে অসহ্য যন্ত্রণা।—কি বলছিস তুই! না না। কিছু ভাবিস নি। আবার আসব।

তমান্নার হাত দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলেছো—কি চাইছিস! আত্মঘাতী!

সেটা চাইব কেন? তাহলে কি ফেরা যায়। বলছি তো, ফিরে আসব ফিরে আসব ফিরে আসব।

আমাকে বলতে তো দোষ নেই, কোথায়?

হেসে উঠেছে তমান্না।—কোথায়! কোথায় এখনও ঠিক হয় নি। ঠিক হোক আগে।

অনজানের কাছে তমান্নার এই কথাটাই বোধহয় শেষ কথা। সকলের অগোচরে তমান্না সরে গেছে।

মিরাজের দেখাশোনার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে অনজানকে দিয়ে। তারপর চার-পাঁচ দিন থেকেছে। খুব অন্যমনস্ক। তারপর আর কেউ চোখে দেখে নি কোথাও।

বলেছিল, চলে যাব। যায় নি।

অনেক খোঁজাখুঁজি। হদিশ মেলে নি। অনজানের সন্দেহ আর কি মিলবে!

তমান্না কারও সঙ্গে কোনো ছল-চাতুরি করে নি। মিথ্যে বলে নি। ফিরে আসার কথাটার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছে না অনজান। অথচ ওকে চেনে বলে অবিশ্বাসও করতে পারছে না।

মিরাজকে বার বার বোঝাচ্ছে। বলেছে যখন নিশ্চয় আসবে। তোমার, আমার, বেগমের-সকলেরই নজর অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার জন্যে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে তমান্না। বলতে বলতে গলা ধরেছে অনজানের। মিরাজের চোখের জল ঝরেছে।

থেকে থেকে মিরাজ তমান্নার গাওয়া গানটা গাইতে বলে।

মহব্বত কে জিন্দগি ইয়াদোঁ মে

অনজান নানা দিক দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে। খুশি করার চেষ্টা করে মিরাজকে। দিল্লি থেকে আগ্রা চলে এসেছে। নিজদের পুরনো ডেরায়। তাজমহল দেখতে প্রতিদিনই নিয়ে আসে নানা সময়ে। তাজমহলের এক একটা অপরূপ দৃশ্য দেখানর জন্যে।

ভোরের আলোয় রুপোলি হয়ে উঠছে গোটা তাজমহল।

রুপোলির পর গোলাপি।

সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবছে। অস্ত যাচ্ছে।

তাজমহল সোনার।

পূর্ণিমার জোছনা ঝরা নিশুতিতে অপরূপ। জীবন্ত হয়ে ওঠে বুঝি। আকাশের চাঁদ ধীরে ধীরে সরছে। তাজমহলও হেলছে দুলছে। পেছনে যমুনার জলে ভাসছে। ভেসে ভেসে চলেছে একটু একটু করে। পরিষ্কার দিনের আলোয় আকাশের কোলে ভেসে ওঠে যেন শ্বেতপাথরের শুভ্র জ্যোতি মাখান তাজমহল।

যার যেমন চোখ তার তেমন দর্শন।

তাজমহল কিন্তু যেখানে, সেখানেই দাঁড়িয়ে।

যেরূপে তার সৃষ্টি সেই রূপে।

প্রতিদিন আসা-যাওয়া শিল্পীদের যে সম্মোহনী শক্তিতে তাজমহল গড়া, সেই সম্মোহনী শক্তি এদের দুজনের মনকে অনেকটা বেঁধে ফেলেছে। এসে এসেও যেন আসা হয় না। দেখে দেখেও যেন সাধ মেটে না।

মাঝে মাঝে চত্বরে বেড়াতে বেড়াতে বলে ওঠে মিরাজ, আমার তমান্না আমার তাজমহল।

অনজান ব্যথার নিশ্বাস চাপতে গিয়ে বলে, হুঁ-উ-উ।

মিরাজের শান্তির জন্যে তমান্না কোথায় কেউ জানে না। জানে অনজানকে।

মিরাজের চিন্তায় অনজান ক্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তারদের মতে অনেক দুঃখ-বেদনা সয়ে সয়ে আজ কম জোর দুর্বল হার্টের রুগী।

নিশ্বাসের কষ্ট, বুকের ব্যথা কোনোদিন কাউকে জানায় নি অনজান। মিরাজকে তো নয়ই। ডাক্তারদের নিষেধ তাজমহলের একতলা দোতলা করা।

একতলা দোতলা করা বন্ধ করে না অনজান। বন্ধ করা চলবে না। মিরাজ শান্তি পাবে না।

স্মৃতির স্মরণে শ্রদ্ধা জানাতে ওপর নিচে গোলাপের পাপড়ি না ছড়িয়ে পারে না অনজান। পারে না মিরাজ।

অনজানের অত সিঁড়ি ভেঙে চত্বরে উঠে আবার দোতলায় আসা। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে দোতলায় ওঠা।

শত সহস্র বার মানা করছে মিরাজ।

অনজান কথায় কান দেয় নি।

সেদিন সকালে থেকেই শরীরটা ভালো যাচ্ছে না অনজানের।

বিছানায় উঠে বসছে। আবার শুয়ে পড়ছে।

মিরাজকে একলা ছাড়তে চায় নি। তমান্নার কাছে প্রতিজ্ঞা।

মিরাজের সঙ্গে একরকম জোর করেই এসেছে। দেয়াল ধরে ধরে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে ওপরে। ভেতরে ঢুকে গোলাপের পাপড়ি ছুঁড়ে দিয়েই বুক চেপে বসে পড়েছে।

অসহ্য যন্ত্রণা।

মিরাজ পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসেছে বাইরে। ওপর থেকে নামিয়ে চত্বরে শুইয়ে দিয়েছে।

ততক্ষণে সব শেষ।

পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেছে নূরপীরের প্রধান সেবক খাদেমের কাছে। খাদেমসাহেব, অনজানের যন্ত্রণা মেহেরবানি করে কমিয়ে দিন। হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বলেছে।

মিরাজের কাতর প্রার্থনায় খাদেমসাহেব এসেছে।

অনজানের দিকে হাত দেখিয়ে সেই হাত ওপরে তুলেছে। অনজান নেই।

মিরাজ এসেছে খাদেমসাহেবের কাছে।

অনজানকে বড্ড দেখার ইচ্ছে করছে। নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারছি না। হাউ হাউ করে কেঁদেছে মিরাজ।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকেছে খাদেমসাহেব মিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে। এবারে মাজারের দিকে চোখ। দু চোখ বোজা। মাথা নাড়া দেখে মনে হয় কেউ কিছু বলছেন। কারও কিছু কথা শুনছেন।

মুখ ঘুরিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলেছে, তুমি জানবে তোমার দেহটা কাফন—মুর্দা ঢেকে রাখা কাপড়। তার ভেতর তোমার চিন্তা তোমার স্মরণই একান্ত মনের অনজান। এই ধারণারই ছবি তুমি দেখতে পাবে তোমার সামনে। সে অনজান তোমারই মনের তৈরি।

আগের মতো অনজানের সঙ্গে তাজমহল চত্বরে ঘুরে বেড়াবার মতো ঘুরে বেড়ায় রোজ মিরাজ। খাদেমসাহেবের কথা মতো চিন্তা করে। নিজের চিন্তাকে বাইরে দেখে—অনজানকে।

ভেতরের চিন্তাটাকে বাইরে এই ভাবে দেখতে পাওয়াটাও কম পাওয়া নয়। কিছুক্ষণের শান্তি।

নানা রঙের অনজান। তাজমহলের রঙ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার অনজানও সেই রঙে রঙিন হয়ে ওঠে যেন। রুপোলি গোলাপি সোনালি...।

খাদেমসাহেব মিরাজের আগেকার ইতিহাস শুনে বলেছে, ঝুলনকে দেখে মিরাজ আর নসিবের মস্ত দৃষ্টিভ্রম হয়েছে। আপনজন প্রিয়জনকে মানুষ কখনই হারাতে চায় না। অথচ এই দুনিয়ায় না হারিয়েও উপায় নেই। এই দুনিয়ার মাটিতেই তারা হারিয়ে যায়। মানুষের মতো মানুষ অনেক সময় দেখা যায়। চাউনি চলন-বলন ধরন-ধারণ। এখন কি চেহারাটাও। তা বলে সে কিন্তু আগের মানুষ নয়। সে নতুন মানুষ।

নিজের চিন্তার অনেক কথাই তার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার মুখ দিয়ে বলায়। তা বলে সে নিজের অতীত কথা বলেছে মনে করা ভুল।

মিরাজ নসিব আর কুঞ্জার বুক চাপা পাথরের ভারটা নেমে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। নামেনি একমাত্র অঙ্কুরের। আর ঝুলন! তাকে দেখে মনে হয় না তার মনে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

অঙ্কুর কুঞ্জার কানের কাছে মুখ এনে বলেছে, গল্প গল্প। এসব বানান গল্প। আমি বিশ্বাস করি না। আমি যে ভেবেছি তা থেকে এক পা-ও নড়ব না।

বিরক্তির একশেষ কুঞ্জার। বিদ্রূপ করেই বলে উঠেছে, মহাশয়ের নিজের ভাবনা থেকে কে নড়তে বলেছে! আপনি যেতে পারেন। ঝুলনের দায়িত্ব আমার আমি নেব।



তিনতলা।

রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বনবীথি। গাড়ি আসার দিকটায় চেয়ে আছে একদৃষ্টে। গাড়ি আসছে। চেনা গাড়ি। বনবীথির নিজের।

অপেক্ষার অবসান। গেটের সামনে এসে থেমেছে। বুক ঝুলিয়ে ওপর থেকে দেখছে। গাড়ি থেকে নামছে প্রথমে কুঞ্জা। তারপরে ঝুলন।

গেটে প্রবেশ করেছে দুজনে। সঙ্গে নেই অঙ্কুর।

আচ্ছা, স্বপ্ন কি সত্যি হয়!

কেউ বলে সত্যি। কেউ বলে মিথ্যে।

কিন্তু ভোরের স্বপ্নটাতো সত্যি হয়েই গেছে চোখের সামনে। অঙ্কুর নেই সঙ্গে।

আশ্চর্য মিল।

ভেতরে বসবার ঘরে গিয়ে বসেছে বনবীথি।

ওপরে উঠে এসে ওরা দুজনে দুপাশে বসেছে। বেশ হাসিখুশি।

একটু পরে শোওয়ার ঘরে চলে গেছে ঝুলন। সন্ধ্যের আগে নিত্যকার ঘটনা ওর এটা।

বাদশাজাদির সাজে সেজে আয়নার সামনে চুপচাপ চোখ বুজে বসে থাকা। ঘুমোয় কি না কে জানে! একটু পরে যখন চোখ চায়. তখন ঘুমের ঘোর দু চোখে। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে যত আপনজনই হোক না কেন, চিনতে পারে না। গলার স্বরেও না।

সকলেই জানে। কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

ডাক্তার-বদ্যি, সাধু-সন্তদের একই কথা।—এই পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে খানিকটা সরে থাকা, সেটা তো কম শান্তির কথা নয়। কি দরকার অত জানার চেষ্টার!

পাশে বসে বসে বনবীথিকে সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে দিয়েছে কুঞ্জা।

নিশ্বাস ফেলতে গিয়েও যেন জোর করেই বন্ধ করেছে বনবীথি। ফেলে নি। কারও সামনে নিজেকে প্রকাশ করা বা প্রকাশ হয়ে পড়া বনবীথি পছন্দ করে না। এ ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই।

চুপচাপ বসে থেকেছে কিছুক্ষণ। ঘরের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে এনেছে। পুবের দেয়ালে ঝোলান রয়েছে ঝুলনের ছোটবেলার ছবি। পেইনটিং।

ঝুলনের ঐ বয়েসেই হাত ধরে বেরিয়ে এসেছে মনসিজের বাড়ি থেকে।

যেচে মনসিজকে বিয়ে করতে যায় নি বা চায় নি বনবীথি। বরং মনসিজের পক্ষ থেকে একথা বলা যায়, যেচে এসেছে। বিয়ে করতে চেয়েছে।

ঠনঠনে কালিবাড়ির শিব মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছে বনবীথি। পেছনে দিদিমা।

পুবের এক ঝলক রোদ এসে মুখে পড়েছে বনবীথির। হিরের নাকছাবির নীল লাল হলুদ আলো ঠিকরোচ্ছে। কালো কুচকুচে কোঁকড়ান চুল একরাশ—পিঠে ছড়ান। পরনে চওড়া লাল পাড় গরদ। সে এক দৃশ্য!

মনসিজ গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। চোখ ফেরাতে পারছে না। এত সুন্দর, এর আগে নজরে পড়েনি তো! হাসতে হাসতে বনবীথি নিজেদের বাড়ির গাড়িতে উঠে পড়েছে।

হাসিটা মনসিজকে দেখে নয়। দিদিমার কথায়।

নাগরী লো তোর রূপনগরে
কত নাগর আসবে, যাবে দেখে ফিরে

গাড়ি চলেছে।

ড্রাইভারকে দিদিমা স্পিড বাড়িয়ে দিতে বলেছে।

মনসিজের গাড়ির স্পিডও বেড়ে চলেছে সমান তালে।

বাড়িতে পৌঁছেই অবাক কাণ্ড।

গাড়ি থেকে নেমে মনসিজের পরিষ্কার কথা।—আপনারা কি কুলীন কায়স্থ?

দিদিমা কপাল কুঁচকে বলেছে, কেন হে ছোকরা! তুমি কি বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াও জাতের বিচারের জন্যে নাকি! তোমার কি এই কাজ!

মনসিজ একটুও ভাঙেনি। একটুও মচকায় নি। সংকোচ বোধও করে নি।

হলে বিয়ের প্রস্তাবটা দিতুম।

ও বুঝেছি। তুমি ঘটকালির কাজও কর তাহলে! কিরকম পাত্র হাতে আছে শুনি!

পাত্র তো আমি-ই।

বেহায়া নির্লজ্জ!

কেন? খারাপ কি বলেছি? সত্যি কথা বলেছি। মাকে নিয়ে আসছি কাল।

দিদিমার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।—নাতনির বিয়ে-থা দেব না এখন আমরা। ছ্যা—মেয়েদের পেছু-ঘোরা ছেলে। এমনতর দেখি নি তো।

বেশ তো কার সঙ্গে কথা কইতে হবে বলুন!

আ ম'ল যা। ভালো নাছোড়বান্দা ছেলে দেখছি তো। চলে যা এখান থেকে।

যাব তো নিশ্চয়ই। আপনাদের এখানে থাকতে এসেছি নাকি?

দিদিমার সঙ্গে মনসিজের বচসা চলছে। দোতলায় উঠে গেছে বনবীথি।

বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে বলেছে, দিদিমা, অতিথি নারায়ণ। হাসতে হাসতে বলেছে, মন্দিরের কাছ থেকে এসেছে যখন, তখন কে জানে নারায়ণ কি বেশে এসেছে! আর মাথা গরম কর না।

ওপর দিকে তাকিয়ে দিদিমা বলেছে, বয়েস হয়েছে তো মাথার ঠিক রাখতে পারি নে। বীথি তুই ঠিক বলেছিস রে।

দিদিমা ডেকেছে মনসিজকে—ও বাবা, কিছু মনে কর না বাবা! এস বস। হ্যাঁ, অতিথি নারায়ণ, একটু জল খেয়ে তবে যাবে।

এখন নয়। মাকে নিয়ে আসি আগে।

সে কি হয় নাকি! ওপর থেকে বনবীথি বলেছে, বুড়ো মানুষের কথা ফেলতে নেই। যাচা অন্ন ছাড়তে নেই। মহাশয়ের রাগটা খুব দেখছি তো!

মনসিজ হেসে ফেলেছে।

এরপর সকাল সন্ধ্যে রোজই আসা যাওয়া মনসিজেব। জ্যাঠাকে নিয়ে কাকাকে নিয়ে মামাকে নিয়ে। অনুরোধ আর অনুরোধ।

না না করেও শেষ অবধি ফেরান গেল না মনসিজকে। মনসিজ সুঠাম অঙ্গের সুপুরুষ। বড় ঘর। বনেদি পরিবার। কূলে-কূলে দু পক্ষই উঁচু।

বেশ ধূমধামেই শুভ পরিণয় হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে আসতেই কানে গেছে বনবীথির—আহা, বিধাতার মিলন করা। কোন ভিন দেশের রাজারানী এসেছে যেন।

বেজে উঠেছে নহবতের বাজনা। বেজে উঠেছে মঙ্গলশঙ্খ। সধবা মহিলাদের মুখে মুখে উলুধ্বনি।

পুষ্পবৃষ্টি মাথায় করে ঘরে প্রবেশ করেছে বনবীথি।

বনবীথি সুখি। স্বামী সোহাগিনী। ওর ভাগ্য দেখে অনেকেরই হিংসের উত্তাপ বেরিয়ে এসেছে নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

শাশুড়ি বৌ-অন্ত প্রাণ। ননদ কৃত্তিকা বৌদির সঙ্গী সখি।

শ্বশুরবাড়িতে খুশি বনবীথি।

প্রথম প্রথম অত বুঝতে পারেনি বনবীথি। সোনার ঘড়ায় পারা ভরা।

মনসিজ মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি ফেরে না। কিছুদিন বাদে একটু পুরনো হয়ে যেতে মনসিজকেই জিগ্যেস করেছে, তুমি কোথায় যাও? তোমার কি কোনো যত্নের ত্রুটি হচ্ছে?

না।

তাহলে?

জিগ্যেস ক'র না আমায়। সময়ে ঠিকই জানতে পারবে।

মনসিজকে আর কোনো দিন জিগ্যেস করে নি বনবীথি।

কৃত্তিকা বলেছে, বৌদি, জানতে চেও না।

কেন?

উত্তর দেয় নি কৃত্তিকা।

শাশুড়ি মায়ের কাছে যা উত্তর পেয়েছে শুনে হতভম্ব হতবাক। আগে জানলে কখনই বিয়ের ফাঁদে পা দিত না বনবীথি।

শাশুড়ি বলেছে, বৌমা, তোমার ভাগ্য দেখে আমার হিংসে হয়। বলতে কোনো দ্বিধা নেই। মনসিজ খুবই ভালো। সপ্তাহে যদি এক-একদিন বাড়িতে না থাকে, তাকে ক্ষতি কি? তোমার শ্বশুরমশাই যে প্রতিটি রাতই পরবাসী। বড় ঘরে এসব কেউ নজর দেয় না। এ সব দিকে চোখ দিও না। সুখে আছ। সুখে থাক। যেচে গর্ত খুঁড়ো না নিজে পড়বার জন্যে। মনসিজ সোনার চাঁদ ছেলে।

শাশুড়ি খুলেই বলেছে, তোমার জেনে রাখা ভালো ও থাকে আকাশীর বাড়িতে। ছোটবেলা থেকে ভালোবাসা। ভোলা যায় না কি! কুলীন নয় বলেই তো কর্তা বিয়ে দেয় নি। আকাশীও বিয়ে-থা করেনি। ধরতে গেলে মনসিজের প্রথম স্ত্রী আকাশী। তুমি দ্বিতীয়।

প্রথম স্ত্রী আকাশী মেনে নিয়েছে বনবীথি। বাবারও তো দুই বিয়ে। অবিশ্যি প্রথম মারা গেছে। তারপর দ্বিতীয়। বনবীথি তো দ্বিতীয় পক্ষেরই মেয়ে।

মনসিজের ব্যাপারটাকে এক রকম বুদ্ধিবিচারে মেনে নিয়েছে। আকাশীর ওপর কোনো হিংসে-দ্বেষ নেই।

কিন্তু একটা আঘাত বড় মর্মান্তিক। দুঃসহ যন্ত্রণা।

প্রথম মণিমন। পাঁচ বছর বয়েসে কালরোগে ধরেছে। কত না চেষ্টা সুস্থ করে তোলার। কিছুতেই পারা যাচ্ছে না। মনসিজ কম চেষ্টা করছে না। ডবল নিউমোনিয়া। ডাক্তার শেষ সংকেত দিয়ে গেছে।

ক্ষীণ, খুব ক্ষীণকণ্ঠে মণিমন এক নাগাড়ে বলে চলেছে, বাপি বাপি বাপি...।

রাত্তির একটা। শেষ মাঘের শীত।

পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মণিমনের। পুরনো লাল আবীর দিয়ে পা মালিশ করছে কৃত্তিকা। শরীর গরম করে তোলবার জন্যে।

শাশুড়ি মাকে অনুরোধ জানিয়েছে বনবীথি মনসিজকে ডেকে আনার জন্যে।

বৌমা! অমন কাজটি করতে যেও না মা। রাত দুপুরে আকাশীর বাড়ি গেলে ক্ষেপে উঠবে মনসিজ। এরা ভালোর ভালো। খারাপের খারাপ। রক্তে উন্মত্ত রাগের বিভীষিকা ঘুরে বেড়ায়। অনেক ব্যাপারে কত্তাকে দেখেছি।

মনসিজ জীবনে মুখ দেখবে না তোমরা। তোমার স্থান হোক না হোক, আমার মুখ দেখুক না দেখুক, মেয়েটার মুখটাতো দেখে যাক অন্তত। ড্রাইভারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে গাড়ি বার করতে বলেছে বনবীথি।

আকাশীর বাড়িতে গিয়ে কম অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি বনবীথিকে।

বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে গেট বন্ধ করে দিয়েছে মনসিজ।

কাঁদতে কাঁদতে গেছে বনবীথি। কাঁদতে কাঁদতে ফিরেছে।

ঘরে এসে চোখের জল শুকিয়ে গেছে। মরুভূমির উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে।

দেয়াল ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে বনবীথি।

হাপুস নয়নে কেঁদে চলেছে কৃত্তিকা।

মণিমন নেই।

এই পাপপুরীর নরকের নিশ্বাস স্পর্শ যেন একদম মণিমনের দেহ স্পর্শ না করে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে মণিমনের কাছে। সন্তর্পণে তুলে নিয়েছে নিজর বুকে। তিন বছরের মেয়ে ঝুলনের হাত ধরে তুলেছে...।

বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।

সেই আসা এই অতিথি-আলয়ে।

ঝুলন?

ঝুলনের আর বনবীথির—মা মেয়ের ভাগ্যের ভাগ ফলের ফল কি শূন্য?

তাই মনে হচ্ছে।

ভিন্ন খাতে বয়ে গেছে জীবন দু জনের।

কিন্তু শেষমেশ একই।

কুঞ্জার মুখে যা শুনেছে অঙ্কুরের সঙ্গে আর কোনো রকমেই বসবাস করা চলে না ঝুলনের।

অঙ্কুরের দোষ ঠিক দেয়া যায় না। প্রথম জীবনে যে নিদারুণ আঘাত পেয়েছে,

সয়েছেও, অন্য কেউ হলে পাগল হয়ে যেত। ছেলেটা খারাপ নয়।

খারাপ নয় কি করে বলছ মাসি? বলেছে কুঞ্জা।

যুক্তি নেই বিচার নেই। খালি সন্দেহ আর সন্দেহ। খুব সন্দিগ্ধ মনের মানুষ।

যেটা দিশাকে শাসন করতে পারে নি সেই সব জমা ক্ষোভ ঝুলনের ওপর এসে পড়েছে ওর।

এককালের বৌ যখন শাশুড়ি হয়. তখন পুত্রবধূর ওপরে একই নির্যাতন করে সেও। মানুষ যখন সবলের কাছে করার কিছু থাকে না, তখনই হার মেনে যায়। হার মানলেও ভেতরে ক্ষোভের বীজ থাকে। তার চেয়ে যখন দুর্বল কাউকে পায়, তখন তারই ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে সেই দশা অঙ্কুরের।

বনবীথির জগৎ থেকে মনসিজ হারিয়ে গেছে সেদিনই, যেদিন মণিমন তার কোল খালি করে চলে গেছে। সেই দিন থেকেই বনবীথি মনেপ্রাণে বিধবা। সকলেই তাই জানে। সধবা থেকেও বিধবারই সাজ তার। সিল্কের থান। সিল্কের জামা।

ঝুলনও জানে তার বাবা নেই।

ঝুলনের জগতে অঙ্কুরও আজ হারিয়ে গেছে।

বনবীথির মনে হচ্ছে সেই গানের কলির কথা। বাচ্চা ছেলের গলায় বড় মানুষের গান। মাঝে মাঝে ভোর রাতে খঞ্জনি বাজিয়ে গেয়ে গেছে এই অতিথি-আলয়ের ফুটপাথ ধরে।

তোমার আপন কে তুমি চেন তোমাকে

ঝুলনের ছোটবেলার ছবিটার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টে বনবীথি।

ঝুলন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মুখেচোখে হাসি খুশির জোয়ার।

মায়ের পাশে এসে সোফায় বসেছে। তাকিয়ে আছে বনবীথি মেয়ের মুখের দিকে।

মা-কে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলেছে ঝুলন, মা, সুন্দর স্বপ্ন দেখলুম। তাজমহলের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সূর্যের আলোয় আলোয় রুপোলি সোনালি গোলাপি হয়ে উঠছি। আবার চাঁদের জোছনায় সারা শরীর আলোয় আলো। মন-প্রাণ ভরে গেছে। কি সুন্দর। কি সুন্দর। কি আনন্দ। কি আনন্দ।